

আমার দেশের লোককথা

রোম্যানা — বিশ্বনাথম্

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক নূতন সিলেবাস অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের
মাধ্যমিক, জুনিয়ার হাই ও কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয় সমূহের
পঞ্চম শ্রেণীর দ্রুত পঠনের জন্য।
(Vidc Board's letter no. 100015/G. dated 11. 7. 72)

আমার দেশের লোককথা

[পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য]

পরিবর্তিত পঞ্চদশ সংস্করণ

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

জ্ঞানাঞ্জন প্রকাশনী
৩১, কলেজ রো—৭০০০০৯

প্রকাশক
শ্রীপ্রাণগোপাল ঘোষ
চন্দনপুকুর (শিবতলা উঃ)
ব্যারাকপুর; ২৪ পরগণা

প্রথম সংস্করণ : পৌষ, ১৩৭৩
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : মাঘ, ১৩৭৪
তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ : পৌষ, ১৩৭৫
পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ : মাঘ, ১৩৭৮
পরিবর্তিত পঞ্চম সংস্করণ : ১৩৭৯
নতুন পাঠ্যক্রমানুসারে ষষ্ঠ সংস্করণ : অগ্রহায়ণ : ১৩৮০
পরিমার্জিত সপ্তম সংস্করণ : মাঘ, ১৩৮১
অষ্টম সংস্করণ : মাঘ, ১৩৮২
নবম সংস্করণ : মাঘ, ১৩৮৩
পরিবর্তিত দশম সংস্করণ : অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫
একাদশ সংস্করণ : বৈশাখ, ১৩৮৬
দ্বাদশ সংস্করণ : ১৩৮৬ ফাল্গুন, ১৩৮৬
ত্রয়োদশ সংস্করণ : ১লা বৈশাখ, ১৩৮৭
পরিবর্তিত চতুর্দশ সংস্করণ : ২২ পৌষ, ১৩৯১
পঞ্চদশ সংস্করণ : ৪ঠা পৌষ, ১৩৯৩

প্রচ্ছদ শিল্পী : অধ্যাপক নিমাই বসু মজুমদার
অলংকরণ ও অঙ্গসজ্জা : শুভাপ্রসন্ন

পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

মুদ্রক
শিবশঙ্কর প্রেস
৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৯

পঞ্চদশ সংস্করণের ভূমিকা

গল্পবলা বা বানানো মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। ছেলেবেলায় মা-ঠাকুমা ও দিদিমাদের কাছ থেকে রূপকথা বা লোককথা আমরা শুনেছি। সেই সব লোককথার প্রকৃত রচয়িতা কে, রচনাকাল বা তারিখ সঠিক কেউই জানেনা।

বাংলা দেশের মা, ঠাকুমা দিদিমাদের মতো এই বিশাল ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মা-ঠাকুমা ও দিদিমারা যে লোককথা তাঁদের ছেলেমেয়েদের বলেন তার কয়েকটি বাংলার ভাইবোনদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যই **আমার দেশের লোককথা** রচনার অনুরোধ করেছিলাম বহু ভাষাবিদ ও সুবিখ্যাত আন্তঃভারতীয় সাহিত্যিক **শ্রীবোম্মানা বিশ্বনাথম্‌কে**। তিনি আমাদের অনুরোধ রক্ষা করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রেখেছেন।

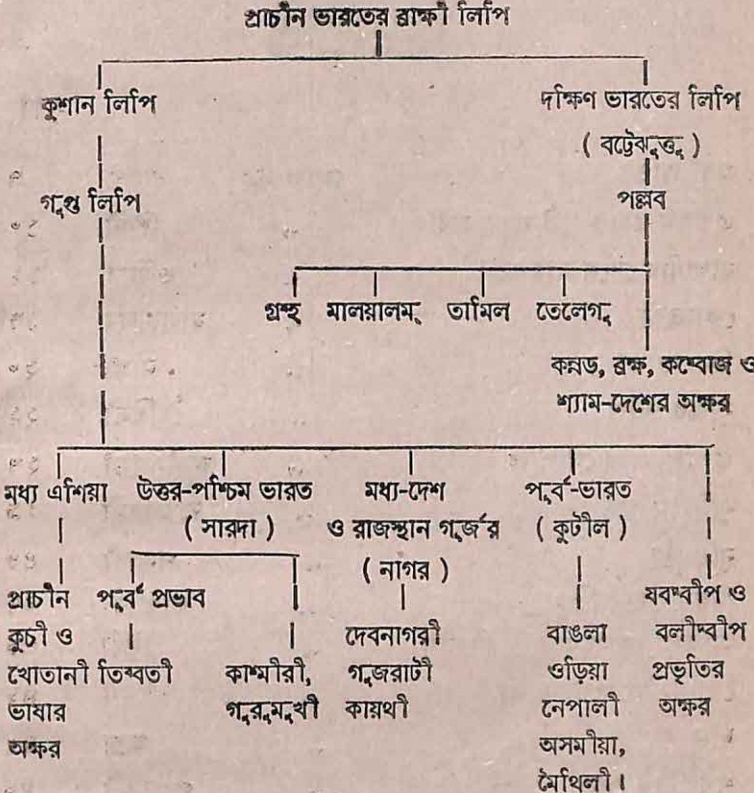
আমার দেশে লোককথার জন্য শ্রীবোম্মানা এবং সর্বভারতীয় সাহিত্যিকদের কাছে আমারা ঋণী।

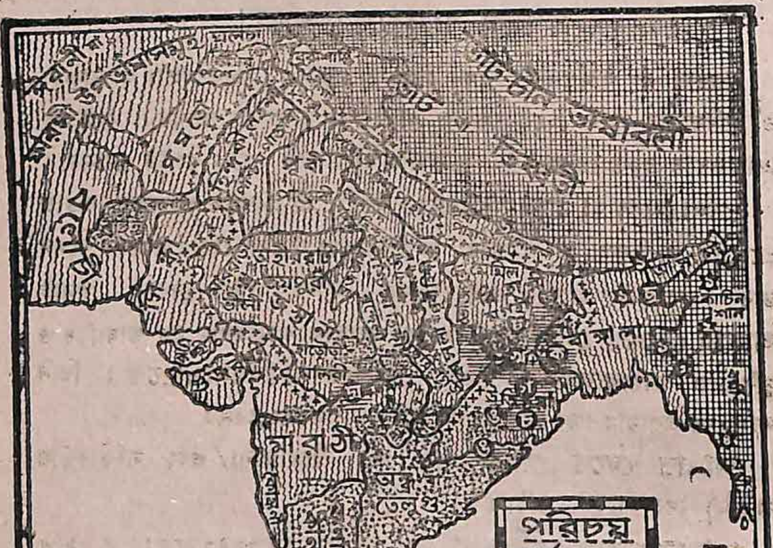
আমার দেশের লোককথা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৭৩ সনে। এ পর্যন্ত চৌদ্দটি সংস্করণ শেষ হয়েছে। বর্তমান পঞ্চদশ সংস্করণ।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষানুরাগী মহলের কাছে থেকে যে-আন্তরিক ও ব্যাপক সাড়া পেয়েছি তা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। পুস্তকখানির আমূল সংস্কারের জন্যে পশ্চিমবাংলার বহু শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে উপদেশ, আদেশ এবং অনুরোধ পেয়েছি, সে-কারণে এ-পুস্তকটি ভেঙেচুরে আরও সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। এই পুস্তকখানিকে সুন্দর করার জন্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য অনুগ্রহ করে এই পুস্তকের অঙ্গসজ্জা করেছেন। তাঁদের সকলকেই জানাই ধন্যবাদ।

২৬শে পৌষ
১৩৯৩

প্রকাশক


প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মী লিপি
কুশান লিপি
দক্ষিণ ভারতের লিপি
(বট্টেঝুত্তু)
গুপ্ত লিপি
পল্লব
গ্রন্থ
মালয়ালম্
তামিল
তেলেগু
কন্নড, ব্রহ্ম, কম্বোজ ও শ্যাম-দেশের অক্ষর
মধ্য এশিয়া
উত্তর-পশ্চিম ভারত (সারদা)
মধ্য-দেশ ও রাজস্থান গুর্জর (নাগর)
পূর্ব-ভারত (কুটীল)
প্রাচীন কুচী ও খোতানী ভাষার অক্ষর
পূর্ব প্রভাব
তিব্বতী
কাশ্মীরী, গুরুমুখী
দেবনাগরী গুজরাটী কায়থী
বাঙলা ওড়িয়া নেপালী অসমীয়া, মৈথিলী।
যবদ্বীপ ও বলীদ্বীপ প্রভৃতির অক্ষর


ভারতবর্ষ
(ভাষা-সমূহ)
শিক্ষা,সাহিত্য ও সাধারণ কার্য্যে যে অঞ্চলে হিন্দী ও উর্দূ ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহার সীমা ++++++++
পরিচয়
আর্য্য -
দ্রাবিড় -
তুলু কোডগু
কোতা, তোদা
গোণ্ড কন্ধ
ওরাওঁ মালতো
ভোট-চীন -
বোডো মেইতেই
লুশেই রাখাইও
(বর্মা) নাগা
নেবারী
অষ্ট্রিক -
সাঁওতালী
মুণ্ডারী হো
কোরকু
শবর গদব
খাসিয়া
লাক্ষাদ্বীপীয়
(মালয়ালম্)
মালদ্বীপীয়
(সিংহলী)
নিকোবরী
[আন্দামানী]
মারাঠী
অন্ধ্র
তেলুগু
বাঙ্গলা
আসাম

সূচীপত্র



মূর্খ পণ্ডিত

লোককথা বাংলা

সব পণ্ডিত, পণ্ডিত হয় না। সব মূর্খ, মূর্খ নয়। বহু পণ্ডিত মুর্খ রয়েছে আর পণ্ডিতও।

যে পণ্ডিতের গল্প বলছি তিনি সত্যিই মূর্খ-পণ্ডিত। কিন্তু স্ত্রীর কল্যাণে তিনি সত্যিকারের পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কুঁড়েমী এবং বোকামীর জন্যে স্ত্রী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে নানান দেশ ঘুরে একদিন সেই পণ্ডিত ফিরে এলেন বাড়িতে।

বাড়ির কাছে এসেই কান খাড়া করে শুনলেন, এক এক করে স্ত্রী একুশটি পিঠা বানাল। ব্রাহ্মণ ডাক দিলেন, বৌ আছ নাকি?

ব্রাহ্মণী বাইরে এসে অবাক হয়ে দেখে পণ্ডিত ফিরে এসেছেন।

ব্রাহ্মণ বললেন, তুমি কি করে, টের পেলে যে আমি আজ ফিরবো? আর অত কাণ্ড করে একুশটা পিঠা বানাচ্ছ কেন?

ব্রাহ্মণীর অবাক দৃষ্টি দেখে ব্রাহ্মণ বললো, অমন হাঁ করে দেখছ কী? শুধু তোমার রান্না ঘরে কেন সারা ভারতে এই মুহূর্তে কতগুলো

পিঠা হয়েছে আমি তা বলে দিতে পারি। আমি আর সেই মুখ্যুটি নেই, এই কয়দিন নানান দেশ ঘুরে অনেক জ্ঞান অর্জন করে এসেছি। তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে ভালই করেছ। আমার শাপে বর হয়েছে।

ব্রাহ্মণী তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লো গাঁয়ের চারদিকে প্রচার করতে। গ্রাম-গ্রামান্তরের মহিলা-মহলে প্রচার হল অতবড় জ্যোতিষী আর ভূ-ভারতে নেই। ছাগল-গরু-ধন-সম্পত্তি কারও কিছু চুরি হলে সে জানতে পারবে ঐ সব কোথায় আছে, কার কাছে আছে। গ্রাম-গ্রামান্তরের লোক আসতে লাগলো। অনেকের অনেক কিছু হারিয়ে গেছে। বহু মানুষ, অনেক প্রশ্ন।

একদিন এক ধোপা তার গাধা হারিয়ে গেছে বলে জানতে এলো কোথায় পাবে কি করে পাবে?

ব্রাহ্মণীর কথামতো ব্রাহ্মণ ঐ ধোপাকে বললো, তোমার প্রশ্ন অনেকক্ষণ ধ্যানে বসে, মা ভবানীকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছি। মা ভবানী আজ ভীষণ চটে রয়েছেন। তুমি আজ ফিরে যাও, কাল আবার ধ্যানে বসবো।

ভোর রাত্রে ব্রাহ্মণী হঠাৎ শুনতে পেল দূর থেকে গাধার ডাক ভেসে আসছে। তৎক্ষণাৎ উঠে ঐ গাধাটিকে ধরে এনে বাড়ির সামনে বেঁধে রাখলো।

ব্রাহ্মণের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। গাধা পাওয়ায় তার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। ব্রাহ্মণীকে বললো, সত্যি কথা বল না গো, গাধাটিকে তুমি চুরি করে এনে কোথায় রেখেছিলে?

ব্রাহ্মণী বললো, ছিঃ, অমন কথা বলতে আছে? তুমি না পণ্ডিত—তুমি না মস্ত বড় জ্যোতিষী? তোমার বৌ কি কখনও চোর হতে পারে?

সকালে ধোপা তার গাধা ফিরে পেয়ে খুব খুশি হল। গাধার পিঠে চড়ে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ঘুরে জ্যোতিষীর অলৌকিক শক্তির কথা প্রচার করলো।

গড়াতে গড়াতে এ কথা রাজার কানে উঠলো। ঠিক সেই সময়

পুরুষানুক্রমে গচ্ছিত রাজার এক অমূল্য হার হারিয়ে যায়। রাজা জ্যোতিষী-পণ্ডিতকে ডেকে পাঠালেন।

পণ্ডিত তো কিছুতেই ঘর থেকে নড়বেন না। পা কাঁপে, বুক ধড়ফড় করে তাঁর। শেষে স্ত্রীর কথায় ভয়ে ভয়ে রাজার কাছে যান।

রাজা জ্যোতিষীর দিক একবার তাকিয়ে বললেন, এই রাজ-প্রাসাদ থেকে কে ঐ হার নিয়েছে জানালে পুরস্কার পাবেন। আর না জানাতে পারলে গর্দান যাবে।

বাড়ি ফিরে উঠতে বসতে ব্রাহ্মণ মা ভবানীকে বলতে থাকে— হে জগদম্বা, এবার যে সর্বনাশ হবে। জগদম্বা বল, কোথায় আছে হার।

রাতদিন ব্রাহ্মণের মুখে ঐ এক কথা। একদিন সকালে রাজ-প্রাসাদের জগদম্বা নামে এক দাসী ব্রাহ্মণের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় তাঁর মুখে ঐ কথা শুনে থমকে দাঁড়ায়। কাঁপতে কাঁপতে ব্রাহ্মণের সামনে এসে বলে, পণ্ডিতমশাই, আপনি টের পেয়ে গেছেন যে আমিই চুরি করেছি। ওই হার সত্যি আমিই চুরি করেছি। আমাকে বাঁচান। এ-কথা রাজা জেনে গেলে আমার প্রাণ যাবে। ওই হার আপনি যেখানে বলবেন সেখানেই রেখে আসবো। আমাকে বাঁচান, পণ্ডিত মশাই!

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দাসী জগদম্বার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, ওই হার একটি হাঁড়ির ভিতর রেখে সেই হাঁড়ি রাজপ্রাসাদের পুকুরে ডুবিয়ে এসো। সাবধান, কেউ যেন টের না পায়। আজ রাত্রেই কাজ সারবে।

পরের দিন পণ্ডিত নামাবলি অঙ্কিত চাদর গায়ে দিয়ে বুক টান করে রাজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, মহারাজ! আপনার হার আপনারই প্রাসাদের পুকুরে রয়েছে।

তৎক্ষণাৎ রাজার লোক পুকুর থেকে সেই হাঁড়ি তুলে আনলো। রাজা অত্যন্ত খুশি হলেন। রাজার নির্দেশে মূর্খ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্থান হল রাজপ্রাসাদে। সেইদিন থেকে তিনি হলেন রাজজ্যোতিষী।

———



একজন চোর দুটি সত্য কথা

লোককথা হিন্দী

একজন চোর। সারা জীবন কেটেছে চুরি করে। চুল পাকিয়েছে ওই করে। হাত পেকেছে অনেক আগে। বুড়ো বয়সে হঠাৎ মতিগতি বদলাল। পুণ্যি করতে ইচ্ছে করল। উপদেশ নিতে গেল এক মহাত্মার কাছে। বলল, আপনি এমন একটা উপায় বাতলে দিন যাতে চুরির পাপ থেকে মুক্তি পাই।

মহাত্মা—কান ধরে বল আর কোনদিন চুরি করবে না। তা হলেই তুমি ঠিক হয়ে যাবে।

চোর—আজ্ঞে, চুরি করা আমার ছোটবেলা থেকেই স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। কথায় বলে, স্বভাব না যায় ম'লে। চুরি করা ছাড়তে পারব না। আপনি অন্য উপায় বলুন।

মহাত্মা—বেশ, তাহলে কথা দাও, সত্যি কথা বলবে।

চোর—দিলাম। মিথ্যা কথা বলব না।

একদিন রাত্রে সেই চোর এক রাজার ঘরে ঢোকে চুরি করতে। রাজা ছদ্মবেশে আশেপাশে ঘুরছিলেন। রাজা চোরকে দেখে বললেন, কে তুমি? এখানে এসেছ কেন?

খুব মুশকিলে পড়ল চোরটা। সে যে কথা দিয়েছে মিথ্যা কথা বলবে না। কাজেই চোর বলল, আমি চোর। রাজার মহলে চুরি করতে এসেছি। তুমি কে?

রাজা—আমিও চোর। আমাকে তুমি সঙ্গে নিতে পার। সাহায্য করব।

চোর রাজার কথা বিশ্বাস করল। তাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে দেওয়াল টপকে ভেতরে ঢুকল। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এলো দুটো সোনার ইঁট নিয়ে।

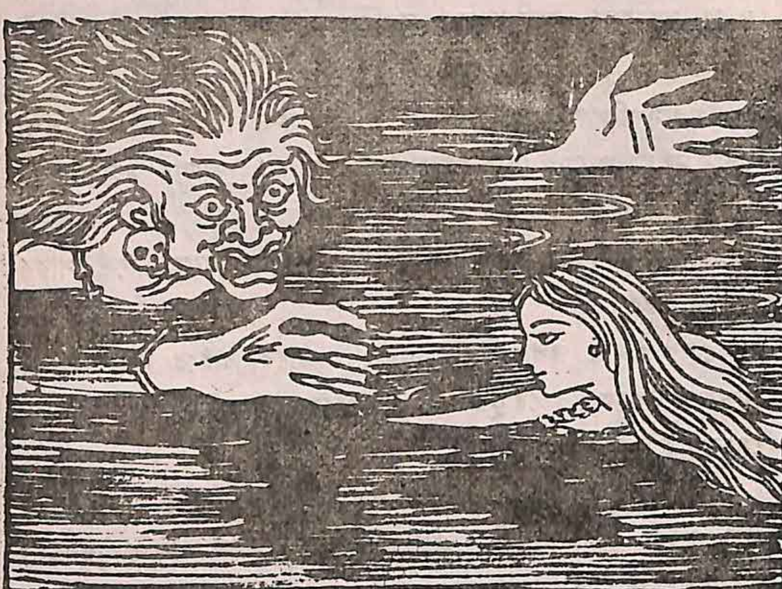
চোর—তিনটে সোনার ইঁট পেলাম। তবে নিয়ে এলাম শুধু এই দুটো। নাও তুমি একটা। আর আমি নিচ্ছি একটা। তারপর চোর চলে গেল নিজের বাড়ি।

পরের দিন ভোরে রাজা মহলের ঐ ঘরে ঢুকে দেখে সত্যি একটা সোনার ইঁট রেখে দিয়েছে চোর। হঠাৎ রাজার খেয়াল হল দেখা যাক এবার নিজের লোককে পরীক্ষা করে। রাজা মন্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, মন্ত্রী, কাল রাত্রে চোর ঢুকেছে। দেখ তো ঐ ঘরে তিনটে সোনার ইঁট ছিল। আছে কি না।

মন্ত্রী ঐ ঘরে ঢুকে দেখে তিনটে সোনার ইঁটের মধ্যে মাত্র একটাই আছে। খুব লোভ হল। ওটাকে নিজের জন্যে লুকিয়ে রেখে রাজার কাছে এসে বলে, মহারাজ, চোর তো দেখছি তিনটে ইঁটই নিয়ে গেছে। কথাটা শুনেই রাজা তো অবাক! একি! সরষের মধ্যেই ভূত! রাজার চোখ খুলে গেল। কোন দিন কল্পনা করেন নি যে তাঁর মন্ত্রীই একটি চোর। তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীকে হটিয়ে দিয়েই ঐ চোরকে খুঁজে আনতে মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন রাজা।

তাহলেও বুঝে দেখ সত্যি কথার একটা ফল আছে।

——



রাক্ষসীর দেশে রাজকন্যা

লোককথা ওড়িয়া

সে-দেশে ছিল এক রাক্ষসী। দিনে জলে বাস করত আর রাত্রে বেরিয়ে মানুষ খেত। কয়েক বছরের মধ্যেই এক রাজ্যের রাজা প্রজা সবাইকে সাবাড় করে ফেললো। ঐ রাজ্যে রাজার এক ছোট সুন্দরী মেয়ে ছিল। রাক্ষসীর মন চাইল না তাকে খেতে। মেয়েটিকে নিয়ে গিয়ে জলের তলায় নিজের ঘরে রেখে দিল। দিনের পর মাস, মাসের পর বছর ঘুরে গেল। মেয়েটি কৈশোর থেকে যৌবনে পা রাখল। ঐ রাজকন্যার মাথায় ছিল লম্বা লম্বা চুল। একদিন তার নদীতে স্নান করার সময় চুল ছিঁড়ে গেল। সে ঐ চুল একটি কাঠের কৌটায় রেখে ভাসিয়ে দিল। কৌটাটি ভাসতে

ভাসতে অন্য দেশের তীরে পৌঁছাল। সেই দেশের রাজপুত্র শিকারে যাওয়ার পথে ঐ কৌটা দেখল। খুলে দেখে তাতে বার হাত লম্বা একটি চুল। তার শিকারে যাওয়া আর হল না। ফিরে এল রাজপ্রাসাদে। নিজের ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। খাওয়া-দওয়া বন্ধ। অনেক ডাকাডাকি করেও কেউ দরজা খোলাতে পারল না।

রাজপুত্র এবং মন্ত্রীপুত্রের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীপুত্র দরজায় ধাক্কা মেরে ডাক দিল। দরজা না খুলে রাজপুত্র বলল, আগে তুমি প্রতিজ্ঞা কর, আমি যা চাইব তা এনে দেবে। মন্ত্রীপুত্র অগত্যা তাই করল। তারপর দরজা খুলে বলে, এই চুল যে মেয়ের তাকে এনে দিতে হবে। আমি তাকেই বিয়ে করব। তারপর জলস্পর্শ করব।

মন্ত্রীপুত্র বলল, এ আর এমন কী কাজ। এর জন্যে এত দুশ্চিন্তার কী আছে? তুমি খাওয়া-দাওয়া কর, আমি নিজে এনে দেব ঐ কন্যাকে।

রাজপুত্র খাওয়া-দাওয়া করল। মন্ত্রীপুত্র রাজার কাছে গিয়ে বলল, হুজুর! বারশো ছুতোর ডেকে রাতারাতি একটি 'মন-পবন-নৌকা' তৈরি করতে আদেশ দিন।

রাজার নির্দেশে বারশো ছুতোরকে ধরে আনা হল। রাজা হুকুম দিলেন, কাল সকালের মধ্যে একটি মন-পবন নৌকা বানিয়ে দাও। না পারলে বারশো ছুতোরেরই মুণ্ডচ্ছেদন করা হবে।

রাজার আদেশ শুনে সবাই ভয়ে হতাশায় ভেঙে পড়ল। কাজটি অত সহজে হবে না, তা সবাই জানে। রাজার কথা শুনে ফেরার পথে এক বুড়ো ছুতোর ক্লান্ত হয়ে এক কদম গাছের নিচে গুঁড়ির ওপর মাথা রেখে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। সে নিশ্চিত যে, পরের দিন সকালে তার গর্দান যাবে।

ঐ গাছে এক শকুনি বাস করত। শকুনি ফিরে এলে তার বাচ্চারা খিদের জ্বালায় ডাকাডাকি শুরু করল। বাচ্চাদের সান্ত্বনা

দিতে দিতে শকুনি বলল, আজ যা এনেছি তাই খেয়ে ঘুমিয়ে পড়। কাল বারশো ছুতোর মারা যাবে; কাল তোদের পেট ভরে খাওয়াব। আর যাই হোক, ওরা কোনক্রমেই মন-পবন নৌকা বানাতে পারবে না। কোন কাঠে যে হবে তা ওরা জানবে কি করে?

বাচ্চারা জিদ ধরে বলল, কোন কাঠে হবে বল না মা?

শকুনি বলল, আমরা যে গাছে বাস করছি, একমাত্র এই গাছের কাঠ দিয়েই হবে।

বুড়ো ছুতোর এ কথা শুনে যেন ধড়ে প্রাণ পেল। অন্য ছুতোরদের কাছে ছুটে গিয়ে বলল, চল তাড়াতাড়ি ঐ গাছের কাঠ দিয়ে নৌকো বানিয়ে রাজাকে ভেট দিয়ে আসি।

রাজপুত্র সকালে উঠে দেখে নৌকা প্রস্তুত। রাজপুত্র এবং মন্ত্রীপুত্রকে নিয়ে মন-পবন নৌকা রাক্ষসীর আঙিনায় পৌঁছাল। সন্ধ্যা হয় হয়। রাক্ষসী বেরিয়েছে আহারের সন্ধানে। রাজকন্যা ওদের দেখে বলল, সর্বনাশ এখানে এলে কেন? এক কাজ কর এক্ষুনি ঐ নৌকো লুকিয়ে ফেল।

মন্ত্রীপুত্র রাজকন্যাকে সব কথা জানান। সকাল হতে না হতেই রাক্ষসী ফিরে এল। তার আসার আগেই রাজকন্যা ওদের তুজনকে বানিয়ে দিল তুই মাছি। তুজনে মাছি হয়ে একটা শিকের ওপর বসে রইল।

রাক্ষসী এসেই মানুষের গন্ধ পেয়ে বলে, হ্যা রে! এখানে মানুষের গন্ধ পাচ্ছি যে, কেউ এসেছে নাকি?

—এখানে আবার মানুষ কোত্থেকে আসবে? মানুষ বলতে তো এক আমিই আছি। খেতে চাও, আমাকেই খেয়ে নাও।

রাক্ষসী জিভ কেটে বলে, বালাই ষাট! অমন কথা কোন দিন মুখে আনিস নি। আমি মরে যাই তাও আচ্ছা···

সন্ধ্যা হতেই রাক্ষসী আহারের খোঁজে বেরোয়। তার যাওয়ার পরই রাজকন্যা ওদের আবার মানুষ করে দেয়। রাজপুত্রের সঙ্গে

রাজকন্যার বিয়ে হল পরের দিন ভোরে। রাক্ষসীর আসার আগেই আবার তুজনকেই মাছি বানিয়ে রেখে দেয় রাজকুমারী।

দিনের পর দিন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। রাক্ষসীর প্রশ্নের জবাবে রাজকন্যা বলে, এখানে আবার মানুষ কোথেকে আসবে…

এইভাবে অনেক দিন কেটে গেল। এখান থেকে যাবে কি করে তার কোন উপায় খুঁজে পায় না। শেষে মন্ত্রীপুত্র একটা পথ পেল। সে রাজকন্যাকে বলল, আজ রাক্ষসী এলে তার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করবে। তারপর এক সময় প্রশ্ন করবে, তার মৃত্যু কিসের উপর নির্ভর করছে।

রাজকন্যা তাতেই রাজী হল। সেদিন সে রাক্ষসীর পা টিপতে টিপতে কাঁদতে লাগল। তার চোখের জলের একটি ফোঁটা রাক্ষসীর পায়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ সেই-অশ্রু ফোঁটা চোট নিয়ে রাক্ষসী প্রশ্ন করল, মরে যাই আমি, কাঁদছিস কেন? কিসের তুঃখ তোর? আকাশের চাঁদ চাস তো তাই এনে দেব তোর জন্যে। কেন কাঁদছিস, বল?

—মা, ভাবছি তুমি আর কতদিন বাঁচবে। তুমি তো বুড়ি হয়ে গেলে। তুমি মরে গেলে আমার খবর নেবার কেউ থাকবে না। সেই কথা ভাবছি আর চোখের জল সমানে গড়াচ্ছে।

রাক্ষসী তার কথা শুনে হেসে আর বাঁচে না। বলে, ওরে আমি কি আর অত সহজে মরব। আমার যে কি ভাবে মৃত্যু হবে তা কে জানবে বল!

—শুনি না মা।

—তা হলে শোন। আমাদের আঙিনায় এক সিন্দুক পোতা আছে। তার ভেতরে এক ভোঁতা কোদাল আছে। সেই কোদাল দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করলে আর এক ফোঁটাও রক্ত যদি নিচে বা মাটিতে না পড়ে তা হলেই আমার মৃত্যু হবে। এখন তুই বল, তা কি কেউ পারবে?

ওরা দুই বন্ধু মাছি হয়ে শুনছিল রাক্ষসীর কথা।

—মা আমার ওপর টান থাকলে কি আর তুমি আমার জন্যে ধনদৌলত রাখতে না।

—তাও আছে রে পাগলী, তাও আছে। দাঁড়া আনি। যত রাখা ছিল সব এনে তার সামনে হাজির করল।

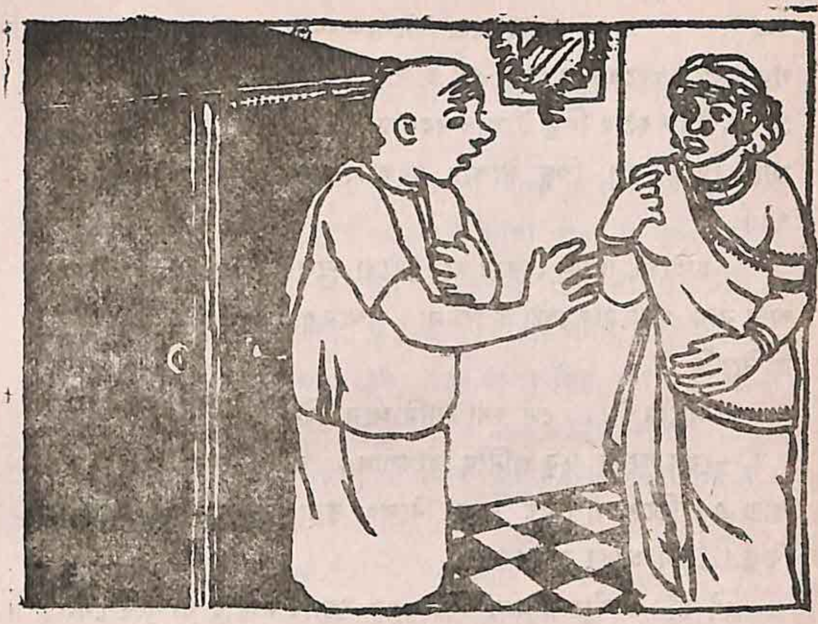
সন্ধ্যা হতেই রাক্ষসী আহারের সন্ধানে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে দুই বন্ধুতে খুঁজে বের করল সিন্দুক আর তার ভেতরের ভোঁতা কোদাল। সকাল হতেই রাক্ষসী অন্যান্য দিনের মতো প্রশ্ন করল আর জবাবও পেল একই ধরনের।

রাক্ষসীর পা টিপে ঘুম পাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীপুত্র ঐ কোদাল দিয়ে রাক্ষসীর মাথায় এক আঘাত করল। রক্ত মাটিতে পড়তে দিল না—পড়ল বিছানায়। চিৎকারে ঘর-দোর উড়ে গেল। শেষে রাক্ষসী গেল মরে।

সেখানে যত ধন-দৌলত ছিল সব নিয়ে রাজকন্যা, রাজপুত্র আর মন্ত্রীপুত্র চলে গেল দেশে।

রাজা, মন্ত্রী এবং বিশিষ্ট উচ্চ-পদাধিকারীরা তাদের স্বাগত জানাল। সারা রাজ্যে এই উপলক্ষে মহোৎসব পালিত হল ঘটা করে।

———



কোচ্চুন্নী

লোককথা মালয়ালম্

সারা কেরালার লোক এক ডাকে চিনত কোচ্চুন্নীকে। আজও তার নাম লোকের মুখে মুখে। কেউ বলে, সে ছিল ডাকাত, আবার কারো মতে সে সত্যবাদী এবং ন্যায়পরায়ণ। কিছু লোকের মতে কোচ্চুন্নী ছিল ইন্দ্রজালিক। মন্ত্র বলে সে নিজের ইচ্ছা পূরণ করত।

কোচ্চুন্নী যে গ্রামে ছিল, সেই গ্রামেই থাকত এক ধনী নায়ার পরিবার। সেই পরিবারের ঘরজামাই আলাদা এক পাকা বাড়ি তৈরি করল। তার দরজা-জানালা বিচিত্র ধরনের। একদিকে কাঠ অন্যদিকে পাথরের কাজকরা। এক বন্ধুর প্রশ্নের জবাবে নায়ার বলেছিল, সেদিন কি আছে ভাই, যে সাধারণ দরজা-জানালা হলেই চলবে। এ হল কোচ্চুন্নীর যুগ, দিনে-দুপুরে ডাকাতি।

কি করে জানি নায়ারের এই কথা কোচ্চুন্নীর কানে গেল।

গৃহপ্রবেশের পর নায়ার পুরোদমে স্থাবর-অস্থাবর জিনিস বন্ধক রেখে ধার দেওয়া শুরু করল। এক প্রতিবেশী দু-হাজার টাকার

গয়না বন্ধক রেখে ধার পেল এক হাজার। ঠিক এই ঘটনার পরেই কোচ্চন্নীরও হঠাৎ কিছু টাকার দরকার পড়ল। সে সোজা নায়ারের কাছে গিয়ে বলল, কিছু টাকার দরকার, দয়া করে দিলে উপকৃত হব।

—চাইছো, দিচ্ছি। তবে মনে রেখো ভুলেও কোনদিন এ বাড়িতে আর নাক-গলানোর চেষ্টা ক'রো না। অনেক ভেবেচিন্তে এ বাড়ি বানিয়েছি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সে কথা আমি অনেকদিন আগেই শুনেছি।

—বেশ করেছ, তবু শুনিয়ে রাখলাম। কারণ, কোনদিন লোভে পড়ে এ বাড়িতে পা দেবে আর নিজের মৃত্যু ডেকে নিয়ে আসবে কিন্তু; সেটা আশা করি চাও না।

এই ঘটনার পাঁচ-ছ মাস পরের এক সন্ধ্যায় নায়ার গা ধুতে গেল, আর তার স্ত্রী ছিল রান্নাঘরে। কিছুক্ষণ পর নায়ার-পত্নীর মনে হল তার স্বামী ডাকছে। ডাক শুনে বাইরে এসে দেখে তার স্বামী দাঁড়িয়ে।

—কি ব্যাপার, গা না ধুয়েই এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে।

—আমাদের প্রতিবেশী কৃষ্ণ পিল্লাই যে গয়নাগুলো বন্ধক রেখেছিল সেগুলো ফেরত নিতে চায়। আমাদের পাওনা টাকা অবশ্য দিয়ে দিয়েছে। গয়নাগুলো দাও, আর এই নাও টাকার থলি। তেল মেখে আমি আর সিন্দুক ছোঁব না।

নায়ার পত্নী তাই করল। এর দশ-পনর দিন পরে কৃষ্ণ পিল্লাই সুদ আর আসল দিয়ে গয়না ফেরত চাইল। নায়ার সিন্দুক খুলে দেখে ঐ গয়নাগুলো নেই। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বউকে জিজ্ঞেস করল। সিন্দুকে রাখা নতুন থলিটার প্রসঙ্গও উঠল।

বউ বলল, দিন দশ-পনর আগে তুমিই তো ওটা এনে দিলে আর গহনাগুলো নিয়ে গেলে।

নায়ারের মনে হল তার কানে যেন গরম সীসে ঢেলে দিয়েছে। আর্তনাদ করে উঠল, কি বলছ তুমি পাগলের মতো!

—পাগল আমি হইনি, হয়েছ তুমি। আজকাল তোমার কিচ্ছু মনে থাকে না।

কথায় কথায় নায়ার সেই থলি খুলে দেখে তাতে ভরা রয়েছে খোলাম-কুচি। সে দৃশ্য দেখে দুজনেরই মাথা ভন্‌ভন্‌ করে ঘুরতে লাগলো। কাণ্ড দেখে কৃষ্ণ পিল্লাই রা করতে পারল না।

চোখে মুখে জল দিয়ে, সুস্থ হয়ে নায়ার বলল, দেখতেই তো পাচ্ছেন, এখন কি করি বলুন তো! হয় টাকা নিন, না হয় গয়না গড়িয়ে দেই।

—নিজের গয়না না পেলে, আপনার তৈরি নতুন গয়না চাই না। টাকাই দিয়ে দিন।

—ঠিক আছে। এক্ষুণি কাঁচা টাকা হাতে নেই। হিসেব-পত্তর করে মাসখানেকের মধ্যেই আপনার পাওনা চুকিয়ে নেবেন। তবে দয়া করে এ কথা কাউকে জানাবেন না। বুঝতেই তো পারছেন, এ বয়সে আর কারও টিটকারি ভাল লাগে না।

মাথা নেড়ে কৃষ্ণ পিল্লাইয়ের চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে কোচ্চুন্নী এসে বলল, কি ব্যাপার? স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই বড় যে মনমরা দেখাচ্ছে।

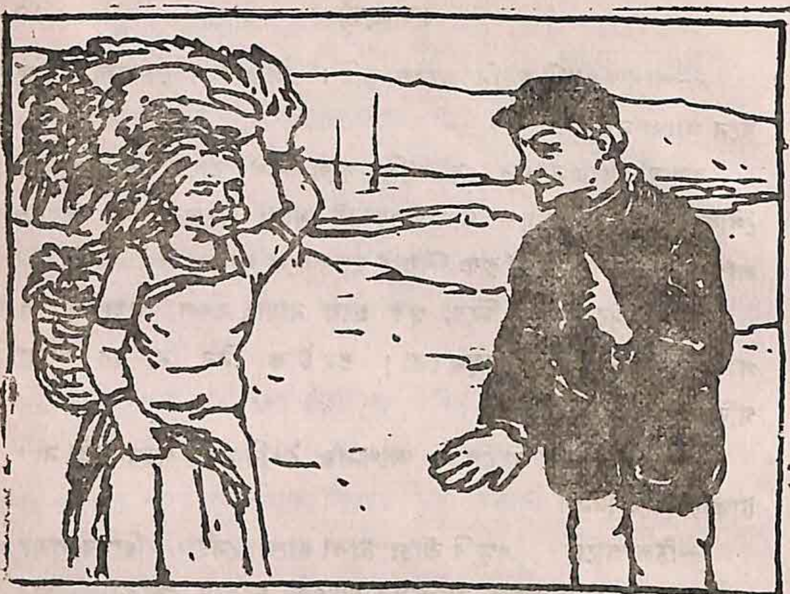
নায়ারপত্নী সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত ভাবে জানাল। ব্যাপারটা নায়ারের কাছে ভাল না লাগলেও নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সব কথা শুনে কোচ্চুন্নী বলল, এ-হে-হে! এ তো বড় লজ্জার কথা। এমন মজবুত বাড়ি করে জিনিস হারাল। শুনুন তাহলে একটা কথা বলি, কোচ্চুন্নীর মনে যদি জাগে কারো জিনিস নেবার ইচ্ছা, সে হেলায় নিতে পারে।

এই নিন কৃষ্ণ পিল্লাইয়ের গয়না। দেখে নিন, ঠিক আছে কি-না।

গয়না পেয়ে নায়ার দম্পতির যেন আনন্দের আর সীমা নেই।

———



বিধবার ভাগ্য

লোককথা নাগা

কোনো এক বিধবার ছিল দুটি ছোট্ট বাচ্চা। ওদের দেখার কেউ ছিল না। বিধবা দিন আনত, দিন খেত। যেদিন কাজ পেত না, সেদিন তিন জনকেই উপোস করতে হত। কতদিন যে উপোসে কাটাত তার হিসেব নেই।

আগের দিন উপোসে কেটেছে। ভোরে কাজ খুঁজতে বেরুল বিধবাটি। অনেক খোঁজাখুঁজি করে কাজ পেল এক বড়লোকের বাড়িতে। বড়লোকের বৌ বললো, কাজটা একটু অন্য ধরনের। সারাদিন ধরে আমার মাথার উকুন বাছতে হবে। দিনের শেষে মজুরি পাবে। টাকা নয়, চাল। রাজী আছ? মাথার সমস্ত উকুন বের করে দিতে হবে কিন্তু।

বিধবা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর বসে গেল কাজে। উকুন বাছার কাজ। সকাল থেকে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে এল বিকেল, বিকেলের পর অন্ধকার নাবল। বিধবাটি বড়লোকের বৌকে পেন্নাম করে চাল চাইল।

বিধবার কথা শুনতে শুনতে বড়লোকের বৌ হঠাৎ মাথা চুলকে একটা উকুন পেয়ে বলল, মজুরি আবার কিসের? কথা ছিল আমার মাথার সব উকুন বের করে দেবে। এই তো একটা বেরুল, আরও কত আছে কে জানে। চাল দেব না ছাই, যাও যাও, আর কোনদিন এ পথ মাড়াবে না।

বিধবার পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল দু-দিন ধরে খেতে না-পাওয়া দুটি বাচ্চার মুখ। কাঁদতে কাঁদতে গেল ডোবার ধারে। শাকপাতা তুলে ফিরছিল তার কুঁড়ে ঘরের দিকে।

শাক নিয়ে ফেরার সময় বিধবার সঙ্গে দেখা হল এক বুড়োর। বুড়ো বলল, কাঁদছ কেন? কাঁদতে নেই। ঘরে ফিরে গিয়ে এই শাক, কুচি-কুচি করে কেটে ঝুড়ি, ধামা, থালা বাসন যতগুলি পাত্র আছে সবগুলোতে কিছু কিছু ফেলে রাখ আর বাকী কিছু শাক রান্না করবে।

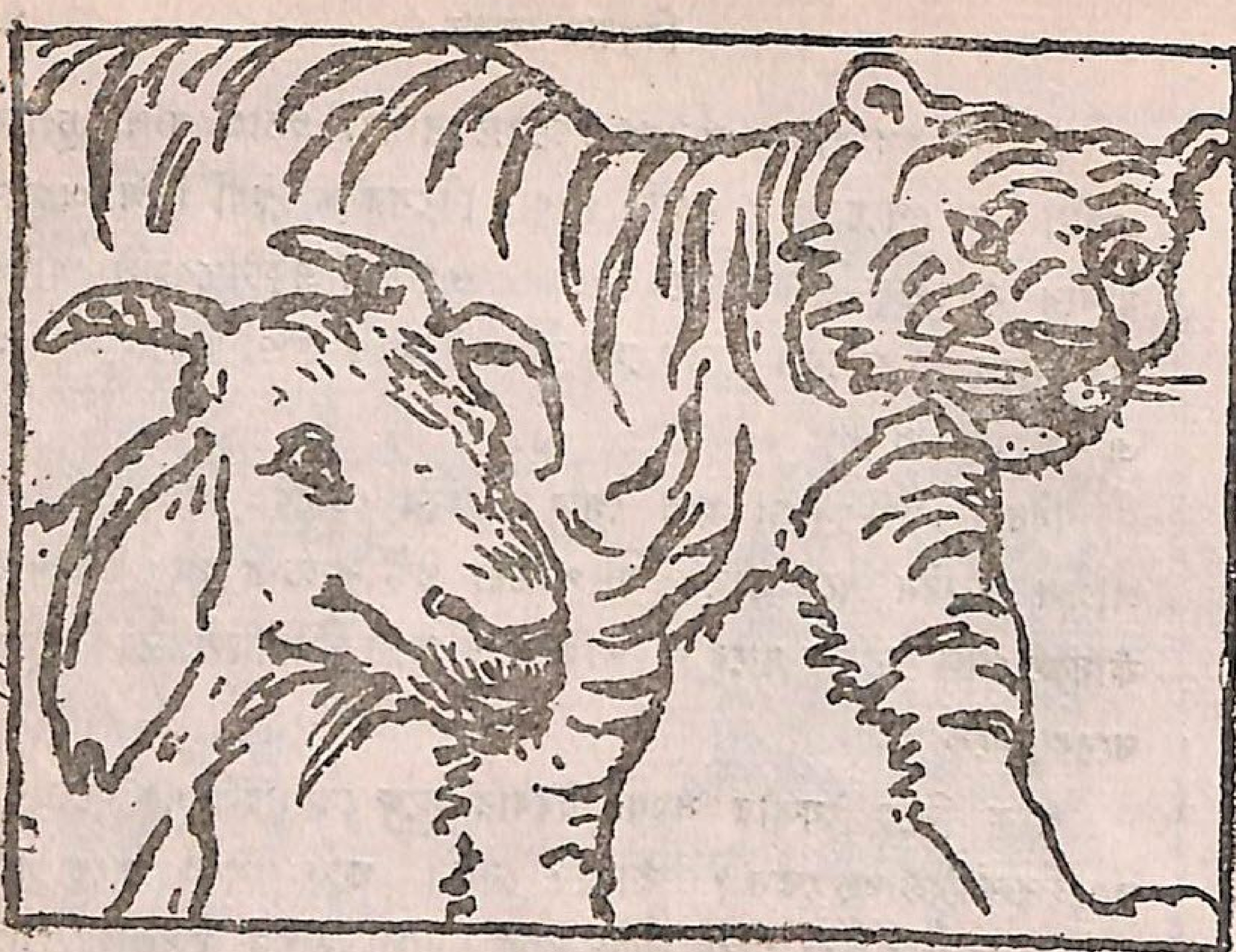
বুড়োর কথামতো বিধবাটি কাজ করল। শাক রান্না করে থালায় ঢালতেই তা আর শাক রইল না, ভাত হয়ে গেল। বিধবার খুব আনন্দ হল। প্রাণ ভরে বাচ্চাদের খেতে দিল। সেদিন রাত্রে সবার টানা ঘুম হলো।

পরের দিন সকালে উঠে বিধবাটি দেখে তার ঝুড়ি, ধামা, থালা বাসন সব চালে ভরে গেছে।

সেদিন থেকে বিধবার কপাল ফিরল। আস্তে আস্তে সে ছাগল, শূয়োর, গরু ও মোষ কিনল।

তার বাচ্চাদুটি বড় হল। বিধবার বুড়ো বয়সটা ভালই কাটল।

মরার দিনেও বিধবা গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগল, শাক দিয়ে ফেরার পথে যে বুড়োর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে কে?



বুদ্ধির দৌড়

লোককথা মৈথিলী

এক ছিল ছাগল। অনেক মানত করার পর তার হল এক বাচ্চা। ছমাস হতে না হতেই কালীপুজো এসো গেলো। ঐ বাচ্চাটাকে কেনার জন্য লোক ঘন ঘন আসতে লাগল। মালিক পাঁঠাটাকে বিক্রি করে দেবে ঠিক করলো। দরদাম ঠিকঠাক। পরের দিন নিয়ে যাবে।

সেদিন রাত্রে ছাগল তার বাচ্চাটাকে বলল, বাবা, তুমি আমার একমাত্র সন্তান। তোমাকে কেনার জন্য পাকা কথা বলে গেছে, আর কাল সকালেই ওরা তোমায় নিয়ে যাবে। তোমাকে মা-কালীর কাছে বলি দেবে। ছ-মাস ধরে তোমাকে কোলে-পিঠে করে বড় করেছি। কাল সকালেই তোমাকে হারাতে হবে। তাই বলছি, আজ রাত্রেই তুমি পালাও। তুমি বেঁচে থাকলে, আমার নাম থাকবে। তুমিও পালিয়ে বাঁচবে।

পাঁঠাটা সেই রাত্রেই গাঁ ছেড়ে পালালো। গ্রাম নগরের বাইরে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। অনেক বড় হল। তিন বছর ধরে ঘোরার ফলে লম্বা লম্বা দাড়ি হয়ে গেলো, শিং হল ভয়ংকর।

একদিক ঘুরতে ঘুরতে জঙ্গল থেকে অরণ্যে ঢুকে গেলো। সেখানে হঠাৎ একটি বাঘ দেখতে পেলো। পাঁঠাটা বাঘকে দেখে পেলো ভয়। বাঘও এই ধরনের একটি জানোয়ার দেখে থমকে দাঁড়ালো—কারণ বাঘ এই প্রথম ঐ ধরনের একটি জীব দেখে ভয় পেলো। পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বাঘ বললো:

লম্বা লম্বা দাড়ি আর গায়ের রঙ কালো,
দেব গলা ধাক্কা, এসেছো কোথা থেকে বলো।

পাঁঠা বললো:

আজেবাজে খাওয়ার পর সাতটা সিংহ খাই,
দশটি বাঘ যেদিন না খাই, সেদিন উপোস যাই।

পাঁঠার কথা শুনে বাঘ বেচারা ছুটে পালালো। পথে দেখা হলো এক শিয়ালের সঙ্গে। সে বললো, বনরাজ আপনি ভয়ে কোথাও পালাচ্ছেন যেন মনে হচ্ছে।

বাঘ থেমে দম নিতে নিতে বললো, শিয়াল পণ্ডিত, কি আর বলবো তোমাকে, আজ এই অরণ্যে মস্ত বড় এক জানোয়ার এসেছে। তার দাড়ি একহাত লম্বা। আর শিং তার চেয়েও বড়। বলে কিনা সাতটা সিংহ আর দশটা বাঘ খায়। তাই ভয় পেয়ে পালাচ্ছি। না পালালে যে আমাকেই খেয়ে ফেলবে।

শিয়াল হাসতে হাসতে বললো, আপনি ধোঁকা খেয়েছেন। যাকে আপনি এত ভয় করছেন সে তো এক ছাগলের বাচ্চা ছাড়া আর কিছুই নয়। ওটাকে তো আপনি এক বেলাতেই সাবাড় করে দেবেন।

প্রথম কথায় বিশ্বাস না হলেও, অনেক কথার পর বাঘের বিশ্বাস

হল। তবু পুরোপুরি বিশ্বাস করতে যেন বাঘ পারছিলো না। তাই সে একটি দড়ির এক প্রান্তে নিজের পা আর অন্য প্রান্তে শিয়ালের পা বেঁধে পাঁঠাটাকে দেখতে গেলো।

বাঘ এবং শিয়ালকে আসতে দেখে পাঁঠা ভাবলো, শিয়াল নিশ্চয়ই জেনে গেছে আমার পরিচয়। একটা কিছু বুদ্ধি না খাটালে বাঘের হাতে নির্ঘাত মৃত্যু। হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। সে চীৎকার করে শিয়ালকে বললো, এই যে বন্ধু, খুব উপকার করলে দেখছি? তোমাকে পই পই করে বলেছি ত্বটো বাঘ আনতে, আর তুমি কিনা এনেছো একটা?

এ-কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাঘ ভাবলো, শিয়াল করে ঠকিয়েছে। আর এক মুহূর্তও দেরি নয়, পালাই।

বাঘ এক নিঃশ্বাসে ছুটে পালাতে লাগলো। আর সঙ্গে সঙ্গে দড়ির টানে শিয়ালকেও হলো পালাতে। কিন্তু অত তীব্র গতিতে সে পালাতে পারলো না। আর দড়িওবাঁধা ছিল শক্তভাবে। আছাড় খেতে খেতে শিয়ালের হলো মৃত্যু।

তারপর থেকে ঐ পাঁঠাটা অরণ্যে আপন মনের আনন্দে বিচরণ করতে লাগলো।

———



কপাল আর গোপাল

লোককথা ছত্তীসগড়ী

দুই বন্ধু। একজন ব্রাহ্মণ অন্যজন ভাট। ভাট একদিন তার বন্ধুকে বললো, চলো, রাজার দরবারে যাই। গোপাল রাজা খুশি হলে আমাদেরও কপাল খুলবে।

ব্রাহ্মণ হেসে বন্ধুর কথার বিরোধিতা করে বললো, পাব তো কপাল জোরে, কী করবে গোপাল? ভাগ্যে যা আছে তাই পাব।

ভাট বললো, না, দেবে তো গোপাল, কপালে কী হবে? গোপাল রাজা মস্ত বড় দানবীর। তিনি আমাদের অবশ্যই অনেক ধন দেবেন।

এই ভাবে তর্ক করতে করতে তারা রাজার দরবারে পৌঁছলো। রাজাকে নিজেদের আবেদন জানালো। ভাটের কথা শুনে রাজা প্রসন্ন হলেন। ব্রাহ্মণের কথা শুনে তিনি হলেন ক্রুদ্ধ। দুজনকেই পরের দিন রাজদরবারে আসার নির্দেশ দিলেন।

দুই বন্ধুতে পরের দিন দরবারে এলো। রাজার হুকুমে ব্রাহ্মণ পেলো এক মুঠো চাল, একমুঠো ডাল, আর একটু নুন।

আর ভাট পেলো এক সের চাল, এক সের ঘি, এবং একটি লাউ। রাজার আদেশে ঐ লাউয়ের ভিতর সোনা পুরে দেওয়া হয়েছিল। রাজা দুই বন্ধুকে বললেন, খাওয়াদাওয়া সেরে সন্ধ্যের সময় দরবারে উপস্থিত হওয়া চাই।

দুই বন্ধুতে একটি নদীর তীরে পৌঁছলো। ভাট মনে মনে ভাবলো, রাজার মনে কী মতলব আছে কে জানে! ব্রাহ্মণকে দিলেন ডাল আর আমাকে দিলেন লাউ। লাউ কেটে তরকারি বানানোর অনেক ঝামেলা। কে করতে যাবে অত ঝঞ্ঝাট। তার উপর কোমরের ব্যথা আবার লাউ খাওয়ার পর বেড়ে না যায়। সাত পাঁচ ভেবে ভাট বললো তার বন্ধুকে, বন্ধু, লাউ খেলে আমার কোমরের ব্যথা বেড়ে যাবে। তুমি এটা নাও, তোমার ডাল আমাকে দাও।

ব্রাহ্মণ তাতেই রাজী হলো। লাউ কাটতে গিয়ে ব্রাহ্মণ দেখতে পেলো সোনা। মনে মনে বললো, আমার ভাগ্যে আছে সোনা, তাই আমি পেলাম। গোপাল রাজা তো ভাটকেই দিয়েছিলেন এই সোনা, কই সে তো পেলো না? ব্রাহ্মণ অর্ধেক লাউ রান্না করে খেলো। বাকীটা কাপড়ের এক কোণে বেঁধে নিল। সোনাও যত্ন করে নিজের কাছে রেখে দিল।

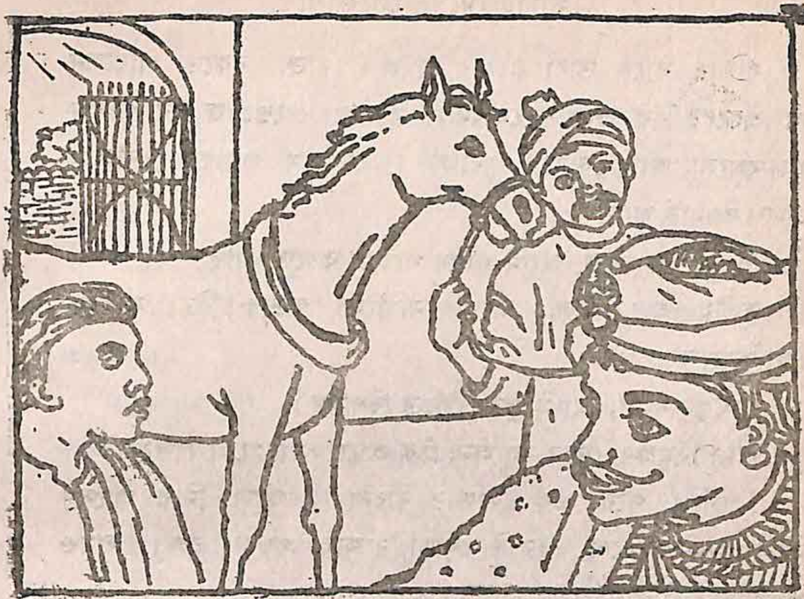
সন্ধ্যার সময় দুই বন্ধুতে গোপাল রাজার কাছে গেল। রাজা ব্রাহ্মণের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, কি এখন বিশ্বাস করছো তো? যে, দেবে তো গোপাল, কী করবে কপাল?

ব্রাহ্মণ সবিনয়ে সব বলে অর্ধেক লাউ রাজাকে দেখিয়ে নম্রভাবে বললো, না মহারাজ, পাব তো কপাল জোরে, কী করবে গোপাল?

এখন রাজা ভাবলেন ব্রাহ্মণের কথাই ঠিক। ব্রাহ্মণের ভাগ্যে সোনা ছিল। ভাটের ভাগ্যে ছিল না বলেই ভাট লাউটা ব্রাহ্মণকে দিয়ে দিল।

রাজা ব্রাহ্মণকে বললেন, তোমার কথাই ঠিক, পাব তো কপাল জোরে, কী করবে গোপাল!

তারপর রাজা ঐ দুই বন্ধুকে পুরস্কার দিয়ে বিদায় দিলেন।



বুদ্ধিমান অন্ধ

লোককথা রাজস্থানী

কোন এক গাঁয়ে চারজন বুদ্ধিমান অন্ধ ছিল। তাদের কাছে টাকা ছিল অনেক। তবে তাদের সিদ্ধি খাওয়ার অভ্যেস ছিল ভীষণ। সারাদিন সিদ্ধি খেত আর বুঁদ হয়ে পড়ে থাকত। এই করে তাদের সব টাকা হলো শেষ। বাড়ির লোক ওদের বললো, কিছু রোজগার করে নিয়ে এসো, না হলে এ বাড়িতে আর থাকা হবে না।

বেচারাদের পথে বেরুতে হলো। অভাব কাকে বলে জানত না এতদিন। অন্ধদের চাকরি দেবে কে? তবু তারা চারজন কপাল ঠুকে বেরিয়ে পড়ল দেশ-দেশান্তরে। ঘুরতে ঘুরতে একদিন তারা এক রাজার দরবারে হাজির হল। অনেক চেষ্টার পর রাজার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেল।

রাজার কাছে তারা চাকরি চাইল। রাজা বুঝতে পারলেন না অন্ধদের কি চাকরি দেবেন। রাজার প্রশ্নের জবাবে একজন অন্ধ বললো, আমি ঘোড়ার পরীক্ষক। ঘোড়ার গুণাগুণ পরীক্ষার ক্ষমতা আমার আছে।

দ্বিতীয় অন্ধ বলল, আমি পাথর পরীক্ষা করতে পারি।

তৃতীয় অন্ধ বলল, আমি নারীদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

চতুর্থজন বলল, আমি পুরুষ-চরিত্র বিশারদ।

রাজা কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, ঠিক আছে সময় মতো ডাকবো।

কিছুদিন পরে এক ঘোড়ার ব্যবসায়ী ঘোড়া নিয়ে আসে। অনেকগুলোর মধ্যে একটি ঘোড়া রাজার পছন্দ হল। দামও পাঁচহাজার টাকায় ঠিক হয়ে যায়।

হঠাৎ রাজার মনে পড়ে গেল সেই অন্ধ ঘোড়া-পরীক্ষকের কথা। তাকে ডেকে পাঠালেন। অন্ধটি তৎক্ষণাৎ এসে কিছুক্ষণ পরীক্ষান্তে বলল, মহারাজ এই ঘোড়া আপনার ব্যবহার-যোগ্য নয়।

শুনেই ঘোড়া ব্যবসায়ী ভীষণ চটে গেল। একটা ঘোড়া বিক্রী হতে-হতে হলো না। সব মাটি হয়ে গেল! তাই সে বলল, মহারাজ! এ অন্ধ, ভালমন্দের বিচার-শক্তি এর কী করে থাকতে পারে?

অন্ধ এতক্ষণ নীরব ছিল। এখন সে বলল, মহারাজ, আজ্ঞা দিলে সবিস্তারে জানাতে পারি।

রাজার নির্দেশে অন্ধটি বলল, এই ঘোড়ার একটি রোগ আছে। যত্ন নিয়ে খাইয়ে দাইয়ে বিক্রির যোগ্য করা হয়েছে। এই ঘোড়ার উপর এখন পর্যন্ত কেউ চড়েনি। এর পিঠের ওপর হাত রেখে দেখেছি কাঁপছে, এর পিঠে উঠলেই কিছুক্ষণের মধ্যেই মাটিতে পড়ে যেতে হবে।

রাজা একজন সেপাইকে ঘোড়ার পিঠে উঠতে বললেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল অন্ধের কথা ফলেছে। তখন মহারাজ অন্ধের গুণে

মুগ্ধ এবং ব্যবসায়ীর আচরণে ক্ষুব্ধ হলেন। ফলে ব্যবসায়ীর জরিমানা হলো পাঁচ হাজার টাকা এবং অন্ধ পুরস্কার পেলো পাঁচ হাজার টাকা।

রাজার কাছে পুরুষানুক্রমে একটি অমূল্য পাথর ছিল। রাজা সমতুল্য একটি পাথর কেনার ইচ্ছা জহুরীদের কাছে প্রকাশ করলেন।

বহু জহুরী রাজার পছন্দসই পাথর এনে দেখাল। রাজার যেটি পছন্দ হলো তার দাম পাঁচ হাজার টাকা। কেনার আগে রাজা দ্বিতীয় অন্ধকে ডেকে পাঠালেন।

অন্ধ লোকটি পাথরটিকে মাটিতে ফেলে আছাড় দিল আর সেটা তখনি গেল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে—প্রমাণ হয়ে গেল যে পাথরটি নকল।

রাজা এক্ষেত্রেও জহুরীকে জরিমানা করলেন পাঁচ হাজার টাকা এবং অন্ধকে পুরস্কার দিলেন পাঁচ হাজার টাকা।

তারপর রাজার ইচ্ছে জাগলো নারী-পরীক্ষককে যাচাই করার। ভাবলেন নিজের স্ত্রীকে দিয়েই পরীক্ষা শুরু করি।

তৃতীয় অন্ধজনকে ডেকে পাঠিয়ে রানীকে পরীক্ষা করার হুকুম দিলেন।

সব কথা শুনে রানী খবর পাঠালেন, আমি এখন চান করছি।

কিছুক্ষণ পরে রাজার লোক আবার গেল। রানী তাদের বললেন, আমি এখন সাজগোজ করছি।

তারপর আর একজন খবর নিয়ে এলো, রানী এখন আহারে বসেছেন।

এই ভাবে প্রত্যেকবার রানী একটা-না-একটা বায়নাক্কা করতে লাগলেন।

তৃতীয় অন্ধটি বলল, মহারাজা আপনার রানী দাসীর কন্যা। আমি তো অন্ধ, আমার সামনে হাজির হওয়ার জন্যে সাজার কোন

দরকার ছিল না। এর থেকেই আমার অনুমান যে আপনার রানী দাসী-কন্যা।

শুনে রাজা রাগে কাঁপতে লাগলেন। সেই মুহূর্তে শ্বশুরবাড়িতে লোক পাঠিয়ে জানতে পারলেন যে অন্ধের অনুমান সত্যি।

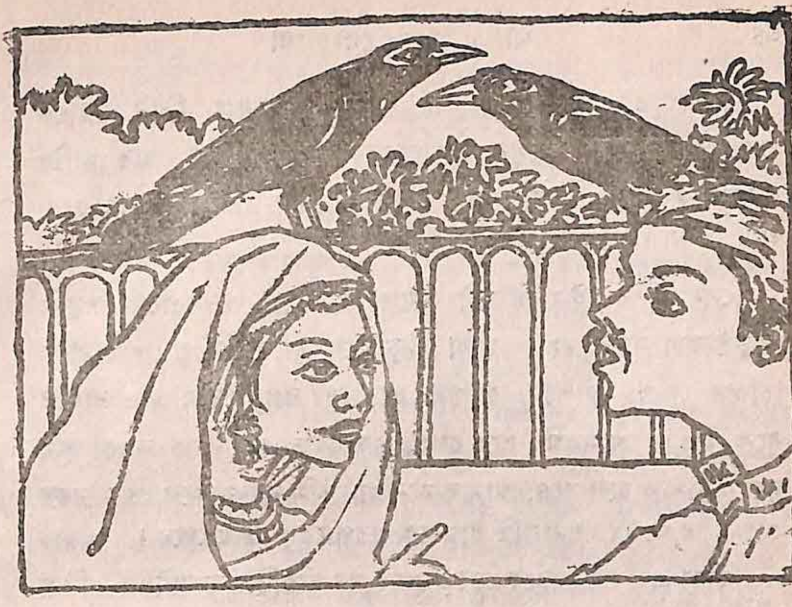
পরিশেষে রাজা পুরুষ-চরিত্র বিশারদকে ডেকে পাঠালেন। আদেশ দিলেন মন্ত্রীকে পরীক্ষা করার।

চতুর্থ অন্ধ বললো, আপনার রানী যে দাসী-কন্যা—সে কথা আপনি, আপনার মন্ত্রী ও আপনার বন্ধু জানতেন। এ-ছাড়া আর কারো জানার কথা নয়। তবুও মহারাজ, আপনি শুনলে হয়তো বিস্মিত হবেন যে আপনার রাজ্যের প্রত্যেকে আপনার পরিবারের এই গোপন কথাটি এখন জানে। এর কারণ আপনার মন্ত্রী নাপিতের পুত্র। তিনি নিশ্চয়ই এই কথাটি পেটে রাখতে না পেরে বাড়িতে গিয়ে নিজের স্ত্রীকে জানিয়েছেন। আর তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে ছড়িয়ে পড়েছে কথাটা।

রাজা অবিলম্বে মন্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জানতে পারলেন যে অন্ধের অনুমান সত্যি।

এরপর রাজা তৃতীয় ও চতুর্থ অন্ধকে পাঁচ হাজার করে টাকা পুরস্কার দিয়ে ঐ চারজন অন্ধকে আজীবন রাজপ্রাসাদে থাকার অনুমতি দিলেন।

— — —



বুদ্ধিমতী

লোককথা পঞ্জাবী

রাজাকে মেরে ফেলে স্বয়ং সিংহাসনে বসার স্বপ্ন দেখছিল সেনাপতি। বারবার ফন্দি আঁটত, কিন্তু ব্যর্থ হত। বুদ্ধিমান মন্ত্রী রাজাকে বাঁচাতেন। তাই সেনাপতি ঠিক করল প্রথমেই মন্ত্রীকে সরিয়ে ফেলার।

একদিন রাজাকে সেনাপতি বলল, মহারাজ, আপনি তো ছোটখাট রাজা নন, আপনার মতো বিরাট রাজার পক্ষে এই ধরনের সাধারণ প্রাসাদে বসবাস করা অনুচিত। আপনি নিজের হাতে কত বড় বড় রাজা মহারাজা খতম করেছেন কিন্তু আপনার মন্ত্রীটি হচ্ছে একটি বুদ্ধির ঢেঁকি। যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে চিন্তা না করুক অন্তত আপনার সুখ-সুবিধার দিক তো চিন্তা করতে পারে। আকাশ আর মাটির মাঝামাঝি জায়গায় আপনার জন্যে একটি প্রাসাদ করে দিতে পারে না? একটু চিন্তা করলেই পারা যায়, চিন্তা করার সময় কোথায়, আপনার অর্থে শুধু নিজের আরাম দেখার বেলাতেই আছে।

সেনাপতির কথা রাজার মনে ধরে। তৎক্ষণাৎ তিনি মন্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়ে হুকুম দিলেন, এক বছরের মধ্যে আকাশ আর মাটির মাঝামাঝি আমার বাসোপযোগী একটি প্রাসাদ বানিয়ে দিতে হবে, আর তা না পারলে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত।

সেনাপতির এই ফন্দি মন্ত্রী বুঝতে পারলেও তার পক্ষে তক্ষুনি কিছুই করা সম্ভব নয়। মাথা নিচু করে বাড়ি ফিরল। স্বামীকে চিন্তিত দেখে মন্ত্রীপত্নী জিজ্ঞেস করে সব কথা জেনে সেও ভাবতে বসে গেল। অনেকক্ষণ পরে বলল, এক কাজ কর, এক বছর তুমি দূরে কোথাও চলে যাও, আমার মনে হয় তুমি না থাকলে এই বছর খানেকের মধ্যেই সেনাপতি রাজাকে পরপারে পাঠিয়ে দেবে।

রাজা এবং পরিবারকে ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না মন্ত্রীর। কিন্তু তবুও যেতে হল। কয়েকদিন ঘোরাঘুরির পর পথে দেখা হল এক বৃদ্ধের সঙ্গে। তার অষ্টাদশী তরুণী কন্যার জন্যে অনেক খুঁজেও উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাচ্ছিল না। নির্জন এবং দীর্ঘ পথ চলতে চলতে পারস্পরিক কথার আদান-প্রদান হল। পথে একটি ছোট্ট খাল পড়ে। বৃদ্ধ জুতো হাতে করে পেরোল। কিন্তু মন্ত্রী তা না করায় বৃদ্ধ ভাবল, লোকটি নিশ্চয়ই বোকা, তা না হলে অত দামী জুতো ভেজায়। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসাই করে ফেলল, খাল পেরোনোর সময় জুতো হাতে করার কথা মনে ছিল না বুঝি?

মন্ত্রী বিনম্র কণ্ঠে জবাব দিল, জীবনের চেয়ে জুতোর দাম তো বেশী নয়। জলের মধ্যে পায়ে কাঁচ অথবা লোহার টুকরো ফুটে গেলে কী অবস্থা হত?

—তা তো ভেবে দেখলে তোমার কথাই ঠিক, না, এখন দেখছি আমিই বোকামি করেছি। ভাল কথা, একা একা কোথায় যাচ্ছ? তোমরা তো সব শহরের লোক, দু-একটা ভাল কথা বল না শুনি।

—আমি আর কি ভাল কথা বলব? তবে ঘরে ঢোকার সময় আমি একটু গলা ঝেড়ে ঢুকি।

—এটা কিন্তু দামী কথা বলেছ, আমি তো তা করি না। আরে

এই তো গাঁয়ে পৌঁছে গেলাম, তা তুমি থাকবে কোথায়? চল, তোমাকে এক সাধুবাবার আশ্রম দেখিয়ে দিয়ে আসি। সেখানেই থাকতে পারবে।

বৃদ্ধ গলা ঝেড়ে ঘরে ঢুকল। তার অষ্টাদশী কন্যা স্নান করছিল, তাড়াতাড়ি কাপড় ঠিক করে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। স্নানের পর বলল, বাবা, তুমি তো কোনদিন কেশে ঢুকতে না ঘরে।

—আর বল কেন মা, এই আজকেই শিখলাম। পথে এক যুবকের সঙ্গে দেখা, কথায় কথায় এই উপদেশ পেলাম। যুবকটিকে সাধুবাবার আশ্রমে রেখে এসেছি। এই যা ভুলেই গেছি, বেচারা ক্ষুধার্ত। খানকয়েক রুটি আর তরকারি পাঠিয়ে দাও তো মা।

অষ্টাদশী চারটে পরোটা এবং একবাটি তরকারি চাকরের হাতে দিলে বলল, সাধুর আশ্রমে এক বিদেশী রয়েছে, তাঁকে এই খাবার দিয়ে বলবে, চতুর্থীর চাঁদ, আকাশ নক্ষত্রভরা।

চাকরটি খাবারের সুগন্ধ পেয়ে তার থেকে একটি পরোটা এবং কিছু তরকারি খেয়ে নিল পথে। বিদেশীর কাছে নিয়ে গিয়ে রাখল বাকী খাবার। আর যে কথা বলার ছিল তাও বলল। খাওয়া সেরে থালা বাটি ফেরত দিয়ে বিদেশী বলল, ওঁকে বলে দিও, তৃতীয়ার চাঁদ, আকাশে গোটাকয়েক তারা।

চাকরের কথা শুনে অষ্টাদশী বুঝল চাকর চুরি করে খেয়েছে। এইভাবে উভয়ের মধ্যে সাংকেতিক ভাষায় কথার আদান-প্রদান চলল অনেকদিন।

বিদেশী শেষে বৃদ্ধের বাড়িতেই এসে থাকল এবং তাঁর খেত-খামারের কাজকর্ম দেখতে লাগল।

বিদেশীর বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হয়ে বৃদ্ধ তাকে ঘরজামাই করার কথা ভাবল। কয়েকদিন পর দুজনের বিয়ে হল।

বিয়ের পর অনেকদিন কেটে গেল হঠাৎ এক সময় মন্ত্রীর মনে পড়ল যে, এক বছর পূরণ হতে আর মাত্র একমাস বাকী। তাঁকে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিষণ্ণ দেখে বৃদ্ধের কন্যা তার কারণ জানতে চাইল।

বারবার অনুরোধ করার পর মন্ত্রী সবিস্তারে আদ্যপান্ত সব জানায়।

অনেকক্ষণ চিন্তা করে মন্ত্রীর নতুন বৌ বলল, এ আর এমন কী সমস্যা ?

মন্ত্রী অবাক হয়ে বলল, বল কি !

—ঠিকই বলছি।

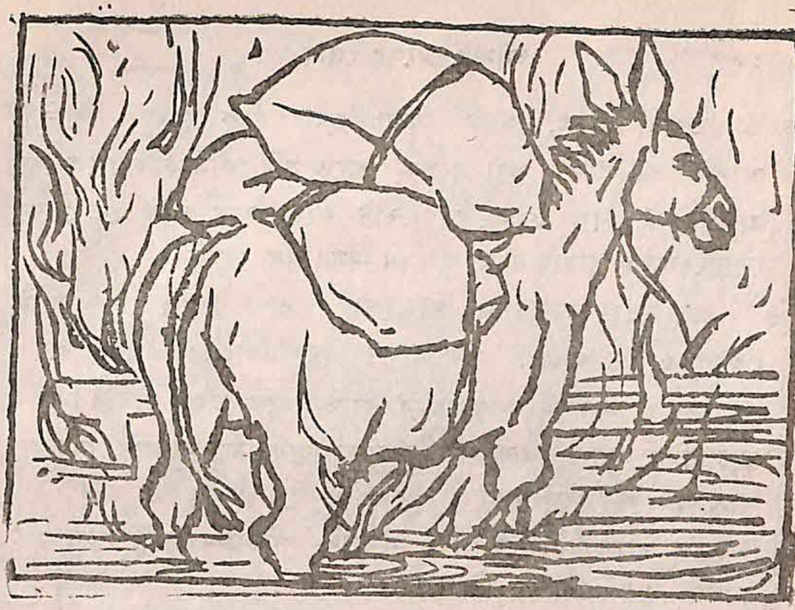
একজোড়া ময়না এনে তাদের শেখাল—মাটি দাও; ইট দাও।

তারপর নির্দিষ্ট দিনে মন্ত্রী রাজপ্রাসাদে গিয়ে বলল, মহারাজ, অনেক ঘুরে ঘুরে মাটি এবং আকাশের মাঝামাঝি জায়গায় প্রাসাদ বানানোর কারিগর এনেছি। ওরা এখন মাটি ইট কাঠ ইত্যাদি চাইছে। এ সমস্ত কিছু সরবরাহের ভার আপনার বীর সেনাপতি সহজেই নিতে পারেন। বিশ্বাস না হয় বাইরে চলুন মহারাজ, কারিগরেরা কি চাইছে আপনি নিজের কানেই শুনবেন।

রাজা বাইরে এসে আকাশ থেকে ক্রমাগত শুনতে পান : মাটি দাও ইট দাও।

রাজা সেইদিনই প্রাসাদ বানানোর জিনিসপত্রের সরবরাহের ভার সেনাপতির উপর দিলেন। স্বভাবতই সেনাপতি তা পারল না, ফলে তাকে মৃত্যুদণ্ড নিতে হল।

এই ঘটনার পর মন্ত্রী আনন্দের সঙ্গে দুই পত্নী নিয়ে জীবনযাপন করতে লাগল।



মিথ্যা কথার রিফু

লোককথা কাশ্মীরী

কোন এক গ্রামে অচ্ছুমিয়াঁ নামে একজন মানুষ ছিল। এক ডাকে তাকে সবাই চিনত। তাকে কেউ বলত গুলরাজ, কেউ বা গুল-সাহানশা। প্রয়োজনে বা নিষ্প্রয়োজন মিথ্যা কথা বলা ছিল তার স্বভাব। অচ্ছুমিয়াঁ যে মিথ্যা কথা বলছে তা লোকে ধরে ফেলত বলে তার ভাল লাগত না। কি করে নির্ভেজাল মিথ্যা কথা বলতে পারবে তাই নিয়ে তার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না।

এ হেন অবস্থায় একদিন এক ভিখারীর সঙ্গে দেখা হল। ভিখারীকে এড়ানোর জন্য অচ্ছুমিয়া বলল, এত ভাল ভাল কথা বলতে পার আর একটা কাজ করে খেতে পার না। কোন কাজের নও, যাও যাও।

ভিখারী বলল, হুজুর কোনও কাজ যে পারি না, তা নয়। তবে কথা কি জানেন, আমি যে কাজ ভাল রকম পারি সেই কাজে আমাকে নেবার মতো লোক পাচ্ছি না।

অচ্ছুমিয়াঁ বলল, কী কাজ পার তুমি ?

ভিখারী বলল, আমি মিথ্যা কথার রিফু করতে পারি। আপনি যদি মিথ্যা কথা বলেন, তাতে যদি কোন ফাঁক থাকে তো আমি সেই ফাঁক এমনভাবে ভরাট করে দিতে পারি যে, কোন লোক ধরতেই পারবে না যা আপনি মিথ্যা কথা বলছেন।

অচ্ছুমিয়াঁ যেন হাতে স্বর্গ গেল। বলল, আজ থেকে আমি তোমায় চাকরি দিচ্ছি। তুমি আমার মিথ্যা কথার রিফু করে দেবে।

ভিখারী সানন্দে অচ্ছুমিয়াঁর কাছে থেকে গেল, চাকরি নিয়ে। দু-চারদিন পরেই অচ্ছুমিয়াঁ নতুন চাকরকে নিয়ে বাজারে বেরুলো। পথে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা।

বন্ধু বলল, কী হে, কাল সারাদিন খুঁজলাম তোমার পাত্তাই পেলাম না। কোথায় ছিলে?

অচ্ছুমিয়াঁ তৎক্ষণাৎ একটা মিথ্যা কথা বলল, কাল পাবে কি করে? কালকে তো আমি শিকার করতে গিয়েছিলাম। সে কী অবস্থা! তাক্ করলাম এক হরিণকে। গুলিটা হরিণের পিছনের পায়ে লেগে তার কান ফুটো করে বেরিয়ে গেল। তারপর হরিণ ছুটতে লাগলো। আমিও ধাওয়া করলাম। ছুটতে ছুটতে পথে পড়ল এক খাল, দেখি, এক গাধা জলে নামতে না নামতেই জ্বলেপুড়ে মরে গেল।

বন্ধু হো হো করে হেসে বলল, না, অচ্ছুমিয়াঁ, বুড়ো হতে চললে কিন্তু গুল মারার স্বভাব তোমার গেল না!

অচ্ছুমিয়াঁ বলল, আরে গুল মারব কেন, বিশ্বাস না হয় আমার সঙ্গে এই চাকরটা ছিল তাকে জিজ্ঞেস কর।

চাকর মাথা নেড়ে বলল, উনি যা বলছেন, তা গুল নয়! ব্যাপারটা কি ভাবে ঘটেছিল, শুনুন তা হলে বলি। হরিণকে যখন উনি গুলি করেন তখন সেটা পিছনের পা দিয়ে কান চুলকাচ্ছিল। তাই গুলি পায়ে লেগে কান ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়। আর গাধার পিঠে ছিল নতুন পাথুরে চুনের বস্তা, তাই জল লাগতেই তা টগবগ করে ফুটতে থাকে ফলে গাধা জ্বলেপুড়ে মরে যায়।

একথা বন্ধু বিশ্বাস করল। আর অচ্ছুমিয়াঁও নির্ভেজাল গুল মারার ইচ্ছা পূরণ হল।



আকবর, ঝাড়ুদার ও বীরবল

লোককথা দিল্লী

একদিন সকালে রাজপ্রাসাদ থেকে নীচের দিকে তাকাতেই আকবর বাদশাহের নজরে পড়ল এক ঝাড়ুদার ঝাঁট দিচ্ছে।

সকাল বেলা অপয়া ঝাড়ুদারের মুখ দেখে বাদশাহের মেজাজ গেল বিগড়ে। মনে মনে ভাবলেন আজ সারাদিনটা খারাপ যাবে। ভাবতে ভাবতে খেতে বসলেন দুপুরে। পাতে হঠাৎ মাছি পড়ল। বাদশাহের ভীষণ রাগ হল। পাত ছেড়ে উঠে পড়লেন। তৎক্ষণাৎ ঠিক করলেন সকাল বেলা তাঁকে মুখ দেখানোর অপরাধে ঝাড়ুদারকে ফাঁসি দেবেন। সেই খবর জানাতে ঝাড়ুদারের কাছে লোক পাঠালেন।

ফাঁসির কথা শুনে ঝাড়ুদারের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সাত-পাঁচ ভেবে সে গেল বীরবলের কাছে। বীরবল আদ্যোপান্ত শুনে তার কানে কানে কী যেন বললেন। ঝাড়ুদার খানিকটা সাহস পেল কিন্তু ভরসা পেল না।

সন্ধ্যায় বাদশাহের নির্দেশ মতো প্রশ্ন শুনে ঝাড়ুদার বলল, মহামান্য বাদশাহ, ফাঁসির আগে আমাকে যে, কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার প্রাণের কথা আমি বলব। ক্ষমা করবেন। সকালে আমার মুখ আপনি দেখেছেন তাই আজ আপনার খাওয়া হল না। আপনার সারাদিন খুব খারাপ কেটেছে। তার জন্য আমাকে অপরাধী করেছেন। ফাঁসি দিচ্ছেন। কিন্তু জাঁহাপনা, সকালে আমি আপনার মুখ দেখেছি বলে আমার আজ ফাঁসি হচ্ছে, সে কথা কি আপনি একবার ভেবে দেখেছেন?

আকবর বাদশাহ থ বনে গেলেন! আর একটা দুশ্চিন্তা হল, ঝাড়ুদারের এই কথা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়লে তাঁকে তো প্রত্যেকে অপয়া ভাববে।

তক্ষুনি তিনি ঝাড়ুদারের মৃত্যুদণ্ড মকুব করে দিলেন।

———



সোনালী কেশের রাণী

লোককথা : উত্তর

ভোরে হরিশ এক বিড়াল নিয়ে ঘরের দিকে এগুচ্ছিল। এক এক পা এগুচ্ছে আর তার মনে ধরফড়ানি।

হরিশ বিখ্যাত ব্যবসায়ী ভাগমলের ছোট ছেলে। তার বড় দুই ভাই তার নিজের নিজের কাজ করে। খেয়ালী ছেলে হয়েছে—ভাগমলের ভাগ্যে একমাত্র হরিশ।

বিড়াল নিয়ে ঘরে ঢুকতে দেখেই ভাগমল তেলেবেগুনে চটে উঠে বাজখাঁই গলার জোরে বলে, তোকে একশ টাকা দিয়েছি বিদেশ ভ্রমণের জন্যে। কালরাত্রে বেরিয়ে, হতভাগা তুই আজ সকালে এক বিড়ালছানা নিয়ে ঘরে ঢুকেছিস। দে আমার টাকা দে।

—ও টাকা দিয়ে আমি এই বিড়ালছানা কিনেছি বাবা, ভয়ে ভয়ে হরিশ বলল।

তারপর হরিশের মা আর তার ভাইয়েরা তার পক্ষ নিয়ে যে যাত্রা বাঁচিয়ে দিল। আর একশটি টাকা হরিশের হাতে দিয়ে তাকে আবার বিদেশ ভ্রমণ করে আসতে পাঠাল।

এবারে হরিশ ফিরল একটি তোতা নিয়ে। বাবা রাগ করল, মা বকুনি দিল আর ভাইয়েরা হরিশকে বুঝিয়ে আবারও একশ টাকা হাতে গুঁজে দিল।

তৃতীয় বার হরিশ ফিরল এক সাপ নিয়ে। বার বার তিনবার। বাবার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। ঐ তিনটি প্রাণী নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলল ছোট ছেলেকে। যে কথা সেই কাজ। বিড়াল, তোতা আর সাপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ছোট ছেলে।

খিদে পেল, কিন্তু খাবার নেই। তখন ঐ তিন প্রাণীকে বলল, এখন তোমরা আমাকে খাওয়াও। খিদেয় আমি মারা যাচ্ছি।

সাপ বলল, কাছেই আমার মামার বাড়ি, চল, সেখানে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মামা আমাকে ফেরত চাইলে তুমি এমনি আমায় ফেরত দিতে রাজী হ'য়ো না। মামাকে বলবে, তোমার আংটিটা দাও, আমি তোমার ভাগনেকে ফেরত দেব। সেই আংটি যদি তুমি একবার হাতে পাও তাহলে তোমার জীবনে কোন কিছুর অভাব হবে না। আংটির কাছে যা চাইবে তাই পাবে।

সাপের কথানুযায়ী সব কাজ হল। সেই আংটি নিয়ে বিরাট এক অরণ্যে বসে হরিশ প্রথমে খাদ্য চেয়ে পেট ভরাল। পর পর বিড়াল এবং তোতার পরামর্শে আংটিকে বলল, এখানে বিরাট একটি সোনার রাজপ্রসাদ করে দাও। আমি সেই প্রাসাদের রাজা হব। সে-প্রাসাদে থাকবে রানী, দাসদাসী, সেনাবাহিনী, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি। তবে একটি কথা সে প্রাসাদ যেন শুধু আমরাই দেখতে পাই।

আংটি হুকুম তামিল করল। হরিশ তার রানীর নাম রাখল সোনারানী। তারপর সোনারানী বলতেই তার মাথার চুল হয়ে গেল সোনার। রানীর মাথা ভর্তি সোনার চুল।

বেশ কাটছিল তাদের দিনগুলো। কাল হল ঐ সোনার চুল নিয়ে। নদীর ওপারের অন্য দেশের রাজকুমারের হাতে পড়ল গিয়ে হঠাৎ একটা সোনার চুল! রাজকুমার প্রতিজ্ঞা করল যার মাথার এ চুল, তাকে তার চাই-ই চাই।

মাসের পর মাস কেটে গেল সন্ধান পেলনা সোনারানীর। একটি পায়রা নিয়ে তবুও সে দিনের পর দিন খোঁজ করতে লাগল। অবশেষে এক যাদুকরের সাহায্যে সোনারানীর খোঁজ পেল।

যাদুকরের কাছ থেকে পাওয়া কাজল চোখে লাগিয়ে দেখতে পেল হরিশের সোনার প্রাসাদ। দ্বাররক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে কোনরকমে পৌঁছে গেল সোনারানীর কাছে।

তাই না দেখে হরিশ রেগে আগুন। রাজকুমারকে কঠিন শাস্তি দেবে ঠিক করল।

কুমারের সঙ্গে যে পায়রা ছিল তা উড়ে গিয়ে রাজার কাছে সব জানিয়ে দিল। রাজা সদলবলে হরিশের রাজপ্রাসাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হরিশ শেষ পর্যন্ত আংটির সাহায্যে জয়ী হল। তারপর হরিশ বন্দীদের সবাইকে ছেড়ে দিল। রাজা এবং রাজকুমারকেও দিল ছেড়ে।

সব যখন শেষ হল তখন হরিশ নিরিবিলিতে বসে ভাবতে বসে।

তাকে চিন্তান্বিত দেখে সোনারানী কারণ জানতে চাইলে সে বলল, তোমার চুল যদি সোনার না হত তবে এসব ঝামেলাই হত না। যে আনন্দ পৃথিবীর জিনিসে আছে অপ্রাকৃত জিনিসে তা নেই। তারপর সোনারানীর কথায় আংটিকে বলে রানীর চুল করে তুলল কালো। রানীর মাথায় কালো চুলের বাহার। তারপর সেই সোনার প্রাসাদও উড়িয়ে দিয়ে হরিশ ঐ আংটি, সোনারানী, বিড়াল আর তোতা নিয়ে বাড়ি ফিরল।

এখন হরিশের হাতে অমূল্য আংটি,—তাই বাবা-মা আর ভাইয়েরা সাদরে তাকে বাড়িতে তুলল।



দান

লোককথা অন্ধ্র

মহারাজ কৃষ্ণ দেবরায়ের মা মৃত্যুশয্যায় আম খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মহারাজ তৎক্ষণাৎ হুকুম করেন আম আনার। কিন্তু তা আনার আগেই তাঁর মায়ের ঘটে মৃত্যু। এ ঘটনায় মহারাজের হল দারুণ দুঃখ। তাঁর মায়ের আত্মা বুঝিবা পরলোকে গিয়েও শান্তি পাবেন না।

ডেকে পাঠালেন পণ্ডিত ব্রহ্মণদের। তাঁরা আগে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিয়ে রাজাকে জানালেন যে মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে সোনার বড় বড় একশোটি আম ব্রাহ্মণদের মধ্যে দানস্বরূপ বণ্টন করে দিলেই মহারাজের মায়ের আত্মা স্বর্গে শান্তি পাবেন

বৎসরান্তে নির্দিষ্ট দিনে রাজা তাই করলেন এবং ব্রহ্মণেরা মহানন্দে বাড়ি ফিরে গেলেন।

দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতির পর তেনালি রামলিঙ্গম বাড়ি ফিরে ব্রহ্মণদের এই চালাকি আর সুযোগ গ্রহণের কাহিনী শুনে ভীষণ চটে গেলেন মনে মনে। ঠিক করলেন ঐ ব্রহ্মণদের জব্দ করবেন।

যতই হোক তিনি কৃষ্ণ দেবরায় রাজার সভাবিদূষক। তাঁর এ-ব্যপারে একটি ভূমিকা থাকা উচিত।

সারা রাজ্যে ঢাক পিটিয়ে দিলেন অমুক দিনে তাঁর মায়ের মৃতু-বার্ষিকী পালন করা হবে আর ব্রাহ্মণদের দান-দক্ষিণার ব্যবস্থা থাকবে।

নির্দিষ্ট দিনে সব ব্রাহ্মণ হাজির হলেন। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্রাহ্মণের পিঠে দাগ পড়ল উতপ্ত লৌহশলাকার। ব্রাহ্মণরা আর্তনাদ করতে করতে রাজার কাছে গিয়ে অভিযোগ পেশ করলেন।

মহারাজ ভীষণভাবে চটে গিয়ে ডাকিয়ে আনালেন তেনালি রামলিঙ্গমকে। জবাবদিহি করতে বললেন এই অপরাধের।

করজোড়ে রাজার সামনে দাঁড়িয়ে রামলিঙ্গন বললেন, মহারাজ, আমি এই মহৎ কাজ করেছি আমার মায়ের আত্মার শান্তি-বিধানের জন্যে।

—ব্রাহ্মণদের গায়ে লৌহশলাকার দাগ বসালে তোমার মায়ের আত্মা শান্তি পাবে? কী বলছ তুমি?

—ঠিকই বলছি মহারাজ। আমার মাএর মরণাপন্ন অবস্থায় বৈদ্য বলেছিল উত্তপ্ত লৌহশলাকার দাগ বসাতে তাঁর গায়ে। মা যেহেতু মৃত্যুবরণ করতে চান নি, অতএব ধরে নিতে পারি যে এই দাগ তাঁর আকাঙ্খিত ছিল। কিন্তু কী বলব মহারাজ, আমি তা করার আগেই মা আমার পরোলোক গমন করলেন। মহারাজ, আপনি যেমন আপনার মায়ের আত্মার শান্তির জন্যে সোনার আম দান করলেন, আমিও সেই উদ্দেশ্যেই এই কাজ করেছি। তবে মহারাজের প্রচুর অর্থ রয়েছে তাই এমনি আমের পরিবর্তে সোনার আম দান স্বরূপ বণ্টন করেছেন, আমার সে ক্ষমতা নেই তাই লোহার শলাকা দিয়েই কাজ সারতে হল। আত্মার শান্তি লাভের বিধান তো আর মহারাজার মায়ের ক্ষেত্রে এক রকম আর আমার বেলায় অন্য রকমের হতে পারে না।

আদ্যোপান্ত শুনে রাজা আর না হেসে থাকতে পারলেন না। ব্রাহ্মণেরা লজ্জায় মাথা নীচু করলেন।



শখ মিটে গেল

লোককথা গুজরাতী

এক গাঁয়ে ছিল এক ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণের নাম দলমুখ শঙ্কর তিওরারী আর ব্রাহ্মণীর নাম চঞ্চলা। সে বেগুনে তরকারি খুব ভালোবাসত। তারা ছিল গরীব। তাই যা খেতে ইচ্ছে করত তা খেতে পেত না।

একদিন চঞ্চলা বলল, হ্যাঁ গা, তুমি তো প্রত্যেকদিন দানা প্যাটেলের বাড়ির পুকুরে চান করতে যাও। ওদের পুকুর পাড়ে কত বড় বড় বেগুন হয়েছে। দু-চারটে ছিঁড়ে আনলে তো পার। কী মনে থাকবে, না আবার মনে করাতে হবে।

দলমুখ বউকে ভীষণ ভয় করত। তাই বেগুন ছিঁড়ে আনার সাহস না থাকলেও চুপ করে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

দানা প্যাটোলর বাড়িতে কেউ ছিল না সেদিন। অগত্যা দলমুখ ঐ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলল, বাড়ি গো বাড়ি, শুনছ আমার কথা? বাড়ি তো আর কথা বলতে পারে না, তাই নিজেই জবাব দিল—

—কী বলছ দলমুখ ?

—ছ-চারটে বেগুন নেব ?

—নাও না দশ-বারটা।

তারপর দলমুখ দশ-বারটা বেগুন নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। চঞ্চলা তো খুব খুশি অতগুলো বেগুন পেয়ে।

তার পরের চারদিন দলমুখ দানা প্যাটেলের পুকুর পাড় থেকে বেগুন আনে আর চঞ্চলা নানান ধরনের তরকারি রেঁধে খাওয়ায়।

দানা প্যাটেল বাড়ি ফিরল সপরিবারে। ফিরে বেগুন ক্ষেতে দেখে বেগুন অনেক কমে গেছে। চোর ধরার জন্যে লুকাল দানা প্যাটেল।

পঞ্চম দিনে দলমুখ যথারীতি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলল, বাড়ি গো বাড়ি, শুনছ আমার কথা ?

—কী বলছ দলমুখ ?

—ছ-চারটে বেগুন নেব ?

—নাও না দশ-বারটা।

তারপর দলমুখ দশ-বারটা বেগুন নিয়ে ফেরার জন্য তৈরী হতেই প্যাটল হাতেনাতে তাকে ধরে বাড়ির সামনের কুয়োর কাছে গিয়ে দলমুখের মতো করে বলল, কুয়ো গো কুয়ো, শুনছ আমার কথা ?

—কী বলছ দানা প্যাটেল ?

—ছ-চারবার চোবাব এই দলমুখকে ?

—চোবাও না দশ-বারবার।

তারপর দলমুখকে হাতেপায়ে বেঁধে কুয়োয় চোবাল ছ-একবার। কাকতি মিনতি করে প্রাণভিক্ষা করে সে যাত্রা রক্ষা পেল দলমুখ। সেদিন থেকে তাদের বেগুন খাওয়ার শখ মিটে গেল চিরদিনের মতো।

———



লোককথা অসমীয়া

পঞ্চপণ্ডিত

একবার এক রাজার দরবারে পাঁচজন পণ্ডিত এলেন। উদ্দেশ্য অর্থ গ্রহণ।

পাঁচজন পাঁচটি বিষয়ে পণ্ডিত—তর্ক, ব্যাকরণ, সঙ্গীত, জ্যোতিষ এবং বৈদ্যশাস্ত্রে।

রাজা ঐ পাঁচ 'পণ্ডিতদের অর্থের আবেদন শুনে, না বলতে পারলেন না, আবার অত সহজে তাদের হাতে রাজভাণ্ডারের অর্থ তুলে দিতেও ইচ্ছে করছিল না তাঁর।

রাজার এই অবস্থার কথা ভেবে মন্ত্রী পরামর্শ দিলেন, মহারাজ, আপনি ঐ পাঁচ পণ্ডিতকে আগামীকাল নিজেদের হাটবাজার করে, রান্না করে খেয়ে আসতে বলুন এই প্রাসাদে।

রাজা এ-কথা শুনে অবাক হলেও মন্ত্রীর উপর তাঁর আস্থা থাকায় পণ্ডিতদের তিনি ঐ কথাই বলে দিলেন।

পরের দিন পাঁচজন পণ্ডিত পাঁচটি কাজের ভার নিলেন। তাড়াতাড়ি রান্না করে খেয়ে যেতে হবে রাজপ্রাসাদে। অনেক দক্ষিণার আশা পূরণ হবে।

তর্কশাস্ত্রে যিনি পণ্ডিত তিনি গেলেন ঘি আনতে। বাজার থেকে ফেরার সময় তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল পাত্রে ঘি আছে, না ঘি-এ পাত্র আছে। পাত্রাধার-ঘি না ঘি-আধার পাত্র? কোন্‌টা। এই কথা ভাবতে ভাবতে পরীক্ষা করার জন্যে তিনি পাত্র দেখলেন উল্‌টে। তৎক্ষণাৎ ঘি গেল সব পড়ে। তিনি খালি হাতে ফিরলেন অনেক দেরিতে।

ব্যাকরণের পণ্ডিত গেলেন দই আনতে। গোয়ালিনীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে লক্ষ্য করেন যেভাবে সে কথা বলছে তা ব্যাকরণগত ভাবে ভুল। তিনি ভুল ধরানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু গোয়ালিনী পণ্ডিতের কথা মেনে নিতে কিছুতেই রাজী হল না। অবশেষে গোয়ালিনী ভীষণ রেগে পণ্ডিতের মাথায় দইয়ের হাঁড়ি দেয় ভেঙে। পণ্ডিত সেই অবস্থায় ফিরলেন।

সঙ্গীতের পণ্ডিতের উপর ভার ছিল ভাত রাঁধার। তিনি হাঁড়ি বসিয়ে চাল ঢেলে কিছুক্ষণ পর লক্ষ করেন চমৎকার ছন্দে ভাত ফুটছে। তিনি সেই তাল আর লয়ে বিভোর হয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর অন্য রকমে ভাত ফুটতে লাগল। তাল গেল কেটে। পণ্ডিতের মেজাজ বিগড়ে গেল। তিনি এক থাপ্পড় মেরে হাঁড়ি দিলেন উল্টে ফেলে। ভাত আর হল না।

চতুর্থজন জ্যোতিষী। তিনি কলাপাতা আনতে গিয়ে গাছে হাত দিতেই শুনলেন টিকটিকির ডাক। সেই মুহূর্তে টিকটিকির ডাক তাঁর মতে অশুভ লক্ষণ। কাজেই কলাপাতা আর আনা হল না তাঁর।

শেষজন গেলেন তরিতরকারির বাজারে, তিনি বৈদ্যপণ্ডিত।

তাঁর মতে সেই ঋতুতে বিশেষ করে সেইদিনে যে ধরনের তরকারি খাওয়া উচিত, যে ধরনের তরকারি সেইদিন স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল— তা পেলেন না। অগত্যা কোন তরকারি না নিয়েই মন খারাপ করে ফিরতে হল তাঁকে।

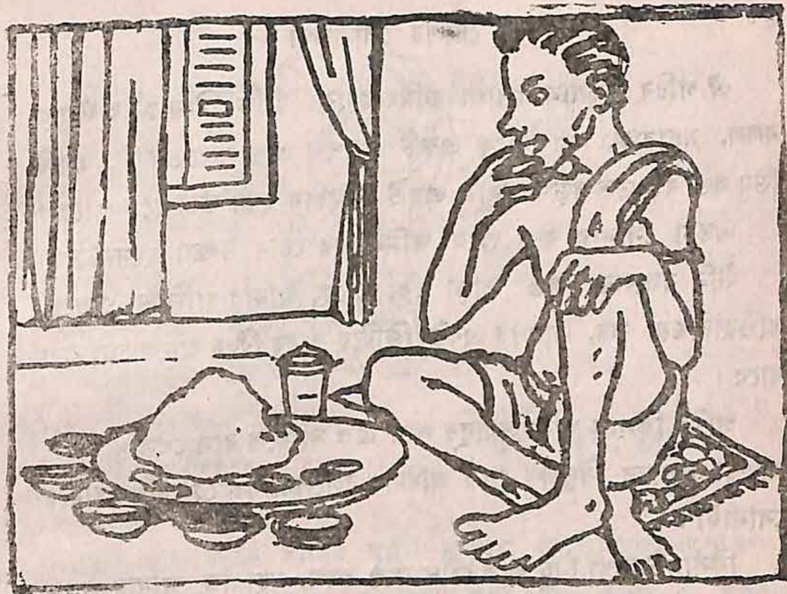
এ সব কারণে তাঁদের খাওয়া হল না। তাঁরা ঠিক করলেন না খেয়েই যাবেন প্রাসাদে।

এদিকে চতুর মন্ত্রী ঐ পাঁচজন পণ্ডিতের পিছনে লোক লাগিয়ে তাঁরা কি-করে-না-করে খোঁজ রাখছিলেন। সব খবর রাজাকে আগেই দিলেন জানিয়ে।

প্রাসাদে পঞ্চপণ্ডিত এলে রাজা বললেন, গতকাল আপনাদের পাণ্ডিত্যে সত্যি আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। ঠিক করেছিলাম আপনাদের অনেক দক্ষিণা দেব। কিন্তু আজ আমার চর জানিয়েছে যে ব্যাবহারিক জ্ঞানের অভাবে আপনারা বাজার করে, রান্না করে খেয়ে আসতে পারেন নি। তাই আজ আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য হল যে আগে ব্যাবহারিক জ্ঞান অর্জন করুন, তারপর পণ্ডিত হিসাবে পুরস্কার পাবেন।

পাঁচজন কেতাবী পণ্ডিত রাজার কথা শুনে নিরাশ হয়ে মাথা নিচু করে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

———



সোনার দাম

লোককথা কন্নড

ছোট গ্রাম। কিসানরাই বেশী ঐ গ্রামে। একদিন সকালে কিসানরা গল্প করছিল। একজন ব্যবসায়ী যাচ্ছিল ঐ পথে। কিসানদের প্রশ্নের জবাবে বণিকটি বলল, জমিদারবাবু কি-এক-কাজে তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

তার কথা শুনে অত্যন্ত গরিব এক কিসান বলল, এমনভাবে বলছেন যেন খুব গর্বের কথা। ইচ্ছে করলে আমি যে-কোন একদিন জমিদারবাবুর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে আসতে পারি।

বণিকটি তেলেবেগুনে চটে গিয়ে বলল, সেটা কি এ জন্মে হবে রে?

কিসানটি বুক টান করে বলল, বাজি রাখুন।

বণিক রাজী হল। ঐ কিসান যদি জমিদারবাবুর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে আসতে পারে তো বণিকটি তাকে একজোড়া বলদ কিনে দেবে, আর তা না পারলে, কিসানটিকে টানা তিন বছর বণিকের জমিতে হাল চালাতে হবে।

ঐ গরিব কিসান সোজা জমিদারবাবুর বাড়ি গিয়ে হঠাৎ তাঁকে বলল, মহারাজ, আপনাকে একটি গোপন প্রশ্ন করতে চাই, একটি ডিম যত বড় তত বড় সোনার একটি টুকরোর দাম কত হতে পারে ?

এতটা সোনার কথা শুনে জমিদারের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উনি বললেন, অত তাড়া কিসের হে, আমার বাড়িতে এসেছে, খাওয়াদাওয়া কর, তারপর একটু জিরিয়ে ওসব বিষয় আলোচনা করা যাবে।

গরিব কিসান জমিদারবাবুর সঙ্গে এক সারিতে বসে খেল। খাওয়া দাওয়ার কিছুক্ষণ পরে জমিদার বললেন, কই হে দেখি তোমার সোনাটা।

কিসানটি মাথা নিচু করে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, মহারাজ, আমার কাছে তো সোনাদানা নেই। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলুম একটি ডিম পরিমাণ সোনার দাম।

জমিদার অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন' যা শালা ব্যাটা, পাজি, বুদ্ধু কোথাকার !

—এঁজ্ঞে, কি বললেন কত্তা, আপনি নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন, আর বণিকের কাছে ফোকটে একজোড়া বলদ—এর পরেও আমাকে বুদ্ধু বলবেন কত্তা ?

পরক্ষণেই ঐ কিসান বণিকের বাড়ির দিকে পা চালাল।

———



চোখের মণি

লোককথা তামিল

কোন এক গাঁয়ে দীঘির ঘাটে মায়েরা জল নিতে এসেছিল সেদিন। মায়েরা যে যার ছেলের গুণের কথা বলতে লাগল। প্রথম জন বলল, বুঝলে বোন, আমার ছেলেটি এমন মিষ্টি গান গায় যে মনে হয় যেন কোকিল ডাকছে। আহা, কি মিষ্টি আর সুরেলা গলা।

দ্বিতীয় জনও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—আমার ছেলেটি ভারী শক্তিমান, গায়ের জোরে গাঁয়ের কেউ তার সঙ্গে এঁটে ওঠে না।

তৃতীয় জন সগর্বে বলল, কুশাগ্র বুদ্ধি আর বুদ্ধিমান যাকে বলে আমার ছেলে হলো গিয়ে তাই। লেখাপড়ায় আশে-পাশের গাঁয়ে তার জুড়ি নেই।

এবার চতুর্থ জনের পালা, সে কিন্তু নীরব। তার অমন চুপ করে থাকাটা অপর তিন জনের কাছে ভালো লাগল না। একটু ঠেস দিয়েই তারা সমস্বরে প্রশ্ন করল—তোমার ছেলেটি কেমন বল না গো বোন। চতুর্থজন তখন শান্ত ও অনুত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর দিল—আমার ছেলেটি একেবারেই সাদাসিধে। তার মধ্যে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য আমি দেখিনি। চারজন মা তারপর—যে-যার ঘড়া কাঁধে তুলে নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হলো। ঘাটের পাশে দাঁড়িয়ে একটি বৃদ্ধ লোক মায়েদের এই আলোচনা শুনছিলেন।

ওরা সব চলতে শুরু করেছে এমন সময় প্রথম জনের ছেলেটিকে

সেদিকেই আসতে দেখা গেল। সে একটি গান গাইছিল। গলায় তার সত্যি সত্যিই কোকিলের পঞ্চম স্বর। নিজের সন্তানের দিকে গর্বোজ্জ্বল চোখে চেয়ে তার মা বলে উঠলো—বাছাকে আমার দেখ তোমরা।

ঠিক সেই মুহূর্তে দ্বিতীয় জনের ছেলেটিকেও আসতে দেখা গেল। মদমত্ত হাতির মতো আমিরি চালে হেলতে দুলতে আসছিল সে। মনে হচ্ছিল অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। দ্বিতীয় জন সগর্বে বলল, এই আমার বীর সন্তান।

ইতিমধ্যে তৃতীর জনের ছেলেও সেখানে এসে পড়েছে। কঠিন সংস্কৃত শ্লোক অবলীলাক্রমে সে আবৃত্তি করতে করতে চলেছে। মুখে-চোখে তার বুদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট। সস্নেহে তার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে তৃতীয় জন হাসিমুখে বলল—এই আমার চোখের মণি।

তারপর সবার শেষে এল চতুর্থ জনের ছেলে। তার চেহারায়, কথায় বা হাবভাবে কোনরকম বৈশিষ্ট্য দেখা গেল না, ভারী সাদাসিদে ছেলেটি। সে কিন্তু এসেই ঘড়ার ভারে ক্লান্ত মায়ের কাঁখ থেকে ঘড়াটি নিল, তারপর ঘড়া মাথায় করে মায়ের সঙ্গে আনন্দে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

তবুও তারা পিছনের বৃদ্ধ লোকটিকে জিজ্ঞেস করল—আপনি আমাদের ছেলেদের দেখলেন তো? তাদের মনে অদ্ভুত এক অনুসন্ধিৎসা এসে যায় যেন।

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন—আমিতো কেবল একটি ছেলেকেই দেখতে পাচ্ছি—আর সে হলো মাথায় ঘড়া নিয়ে মায়ের সঙ্গে নীরবে এগিয়ে চলেছে যে ছেলেটি, সে-ই।

দৃশ্যটি দেখে পূর্ববর্তী তিনজন মায়ের উৎসাহে ভাঁটা পড়ল।

———



অন্ধ করে দাও

লোককথা—কানাড়া

কয়েকশো বছর আগেকার কথা। এক গ্রামে ছিল এক গরিব ফকির। লোকটি খুব ধর্ম মেনে চলত। জীবিকা ছিল তার গাধা, বাঁদর আর কুকুর কেনা-বেচা।

রমজানের মাস। মুসলমান ধর্মে আছে এই মাসে কোন এক রাতে আকাশ প্রসন্ন হয়। ঠিক সেই সময় পৃথিবীর যে কোন প্রাণীর যে কোন বর প্রার্থনা পূরণ হয়।

এই মাসের কোন একদিন দূরের হাট থেকে ফেরার পথে অন্ধকার নেমে আসে। ফকির আস্তানা গাড়ে রাস্তার পাশে।

মাঝ রাতে গাধার ঘুম গেল ভেঙে। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখে আকাশ প্রসন্ন। গাধা ভাবল, এই তো উপযুক্ত সময়। এখন আল্লার কাছে বর চাইলে নিশ্চই তা পাব। নিজে একটি বর চেয়ে তার সহযাত্রী কুকুর এবং বাঁদরকে ডেকে তুলল। তারাও নিজের ইচ্ছে মতো বর চাইল। তারপর ওরা তাদের মালিক ফকিরকেও ডেকে তুলে, নিজেদের বর চাওয়ার কথা জানিয়ে দিল।

সব কথা শুনে ফকির বলল, আগে তোমরা কে কী কী বর চেয়েছ

জানাও। কারণ আমি আল্লার কাছে এমন বর চাইব না যাতে তোমাদের সঙ্গে বিরোধ হয়।

গাধা বলল, আমি আল্লার কাছে সুলতান হওয়ার বর চেয়েছি।

বাঁদর বলল, আমি আল্লার কাছে সর্বশক্তিমান হওয়ার বর চেয়েছি।

কুকুর বলল, আমি বর চেয়েছি তুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সেনাপতি হওয়ার।

ফকির ধৈর্য ধরে সব কথা শুনে আকাশের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রার্থনা করল হে আল্লা, এদের বর পূরণ করার আগে আমাকে অন্ধ করে দাও—যাতে আমাকে আর এদের রাজত্ব দেখতে না হয়।

৩১, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রী,
কলিকাতা-২০

শ্রী [illegible]

[illegible]

[signature]

২৬. ৯. ৬১

মূল্য ৫৫০ পয়সা মাত্র
